গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৬ বর্ষ ১৮ সংখ্যা ১৯ ডিসেম্বর ২০০৩ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

ইরাকি প্রতিরোধ চলবেই

— নীহার মুখার্জী

এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ১৪ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন —

"মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা যদি ভেবে থাকে সাদ্দাম হোসেনের গ্রেপ্তারের সাথে সাথে ইরাকের স্বাধীনতার লড়াই শেষ হয়ে যাবে — তবে সকল স্বৈরাচারী শাসকের মতো তারাও মূর্খের স্বর্গে বাস করছে।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, মার্কিন দখলদারি পুরোপুরি খতম না হওয়া পর্যন্ত ইরাকের দেশপ্রেমিক জনগণ তাদের স্বাধীনতার লড়াই আরও উদ্দীপনা ও দৃঢ়তার সাথে চালিয়ে যাবে ও তীব্রতর করবে।"

অভুক্ত চা শ্রমিকদের আইন অমান্যে
পুলিশের লাঠিচার্জ

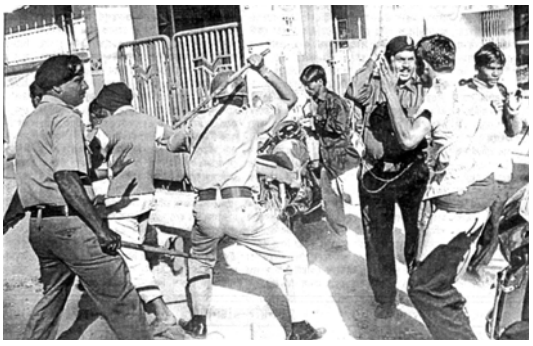

মাসের পর মাস বন্ধ পড়ে থাকা চা-বাগানে শত শত নিরুপায় শ্রমিক আত্মহত্যা করার পরও যে সরকারের পাষাণ হৃদয়ে সাড়া জাগে না, সেই সি পি এম সরকারই অভুক্ত চা-শ্রমিকদের মিছিলের ওপর নির্মম অত্যাচার চালাতে এতটুকু দ্বিধা করেনি। ১০ ডিসেম্বর শিলিগুড়ি শহরের প্রাণকেন্দ্রে এস ইউ সি আই দল এবং নর্থবেঙ্গল টি প্ল্যান্টেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের ডাকে বিশাল শ্রমিক মিছিলের ওপর বামফ্রন্টের পুলিশ হিংস্র জানোয়ারের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে ৫০ জন বিক্ষোভকারীকে গুরুতর আহত করেছে। তারপর নির্লজ্জের মতো বলেছে মৃদু লাঠিচার্জ করা হয়েছে।

বাগান মালিকরা শ্রমিকদের প্রতি কোন দায়িত্ব পালন করেনি — যা নিয়ে সিটু রাজ্য সম্মেলনে নেতারা মায়াকান্না কেঁদেছেন। মালিকরা শতবর্ষের ঐতিহ্যসম্পন্ন বাগানগুলি ধ্বংস করেছে, আইনের কোন

দুয়ের পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎ আইন ২০০৩
চরম জনস্বার্থবিরোধী

১ ডিসেম্বর অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকা) কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে। সংগঠনের সভাপতি ভবেশ গাঙ্গুলি, সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ সম্পর্কে তাঁরা বলেছেন — গত ১০ জুন ২০০৩ থেকে ভারতবর্ষে প্রচলিত বিদ্যুৎ আইনগুলি বাতিল করে দিয়ে 'বিদ্যুৎ আইন ২০০৩' চালু করা হয়েছে। আমরা মনে করি 'বিদ্যুৎ আইন ২০০৩' সম্পূর্ণভাবে জনস্বার্থবিরোধী।

পূর্বতন আইনের আক্রমণেই যখন রাজ্যের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের নাভিশ্বাস উঠছে তখনই বর্তমান 'বিদ্যুৎ আইন ২০০৩' চালু করে জনসাধারণের উপর আরও ব্যাপক আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে। বর্তমান আইনের চরম জনস্বার্থ-বিরোধী দিকগুলি হল — (ক) বিদ্যুৎ শিল্পকে সম্পূর্ণভাবে বেসরকারীকরণ-বাণিজ্যিকীকরণ করে পণ্যে পরিণত করা হয়েছে, (খ) মাশুল নির্ধারণে কোম্পানি আইন অনুযায়ী মুনাফার গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে যার ফলে দাম বাড়বে ৪৮ শতাংশ, (গ) তথাকথিত পারস্পরিক ভরতুকি তুলে দিয়ে অভিন্ন মাশুল চালু করা হচ্ছে, (ঘ) বিরোধ মীমাংসার জন্য গ্রাহকদের কোর্টে বিচার চাইবার গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা হয়েছে, (ঙ) জনগণের বিক্ষোভকে স্তিমিত করার জন্য সরাসরি সরকারের হাতে মাশুল নির্ধারণের ক্ষমতা না রেখে সরকার মনোনীত কমিশনের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়েছে।

এই আইনে ক্যাপ্টিভ উৎপাদনকে উৎসাহ দেওয়া এবং সুযোগ দেওয়া হয়েছে সব থেকে বেশি। একথা সকলেই জানেন, বৃহৎ শিল্প ও বহুজাতিক সংস্থার পক্ষেই কেবল ক্যাপ্টিভ উৎপাদনকারী হওয়া সম্ভব। অর্থাৎ বৃহৎ শিল্প ও বহুজাতিক সংস্থাকে কম দামে বিদ্যুৎ পাইয়ে

চারের পাতায় দেখুন

চার রাজ্যের নির্বাচন
কর্মসূচি নীতি আদর্শের বালাই ছিলনা

হিন্দি বলয়ের চারটি রাজ্যের নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে যত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেখা যাচ্ছে তাতে প্রায় সকলেই বলছেন, বিজেপি মাত করেছে ভোটের কলাকৌশলে, যেটা কংগ্রেস পারেনি। অর্থাৎ, এই নির্বাচনী লড়াইয়ে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী বুর্জোয়া দলের মধ্যে কর্মসূচি, নীতি ও আদর্শের ভালমন্দ নিয়ে লড়ালড়ির কোন বালাই ছিল না, তা থাকার ব্যাপারও নেই এবং তার দ্বারা জনসমর্থন আদায় করার দায়ও ছিল না। সবটাই ছিল 'কলাকৌশল'। এই কলাকৌশলটি বর্তমান পার্লামেন্টারি রাজনীতিতে যে কী কদর্য রূপ নিয়েছে তার পরিচয় ইতিপূর্বে এবং এবারও বিজেপি ও কংগ্রেস উভয়েই দিয়েছে। অন্যান্য পার্লামেন্টারি দলও এ-ব্যাপারে পিছিয়ে থাকেনি। গদি দখলের জন্য এই নোংরামি এখন পার্লামেন্টারি রাজনীতির বৈশিষ্ট্য বা ধর্মে পরিণত হয়েছে।

ভোটের প্রচারে বিজেপি ও কংগ্রেস দুই দলই একে অপরকে চোর ও নিজেকে সাধু প্রতিপন্ন করার দৌড়ে নেমেছিল, যেটা এখনও চলছে। মধ্যপ্রদেশে উমা ভারতী নির্বাচনী প্রচার মঞ্চে এক ধর্ষিতাকে এনে, তাঁকে ১ লক্ষ টাকা সাহায্য দেওয়ার ঘোষণা করলেন। এরপরই ছত্তিশগড়ের কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী অজিত যোগী ফাঁদ পেতে বিরোধী বিজেপি নেতা দিলীপ সিং জুদেওকে ফাঁসালেন একটি ভিডিও ছবিতে তিনি হাত পেতে ঘুষ নিচ্ছেন, তা দেখিয়ে। দুই সেয়ানের খেলায় এরপর ভোটের ফল বেরোতে না বেরোতেই বিজেপি নেতারা পাল্টা ফাঁদ পেতে অজিত যোগীকে ফাঁসালেন। কংগ্রেস হেরে যাওয়া সত্ত্বেও অজিত যোগী বিজেপি এম এল এ-দের বিপুল টাকা দিয়ে ভাঙাবার ষড়যন্ত্র করছেন — এই অভিযোগ এনে প্রমাণ স্বরূপ টেপে ধরে রাখা অজিত যোগীর কণ্ঠ শুনিয়ে দেওয়া হল সাংবাদিক সম্মেলনে।

লোকসভায় দাঁড়িয়ে বিজেপি নেতা প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ি বললেন, দল ভাঙানোর নোংরা খেলার জন্য অজিত যোগী দোষী। যেন এই অপবিত্র কর্মটি বিজেপি কোথাও করেনি বা করেনা। ইতিহাস বলে, উত্তরপ্রদেশ সহ বহু রাজ্যেই গদিতে বসার জন্য বিজেপি অন্য দল ভাঙিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, দিলীপ সিং জুদেও নির্দোষ। এভাবে তিনি কংগ্রেসকে চোর-জালিয়াতদের দল বলে দেখিয়ে নিজের দল বিজেপিকে সাধু বানালেন। অন্যদিকে কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী কংগ্রেস থেকে অজিত যোগীকে 'সাসপেণ্ড' করে দেখাতে চাইলেন অজিত যোগীর কুকর্মের সঙ্গে যেন কংগ্রেসের কোনও সম্পর্ক নেই,

সাতের পাতায় দেখুন

চাষীদের কাছ থেকে ন্যায্য দামে ধান কিনতে হবে

রাজ্য সরকার কর্তৃক অবিলম্বে ধানের বিক্রয়মূল্য কুইন্টাল প্রতি ৬৫০ টাকা ধার্য করার এবং সরকার ও এফ সি আই-কে সরাসরি চাষীদের কাছ থেকে ধান কেনার দাবি জানিয়ে এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ গত ৯ ডিসেম্বর নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন ঃ

বিগত বছরগুলির ন্যায় এবছরও ইতিমধ্যেই ধানের অভাবী বিক্রি শুরু হয়ে গেছে। সরকার লাভজনক মূল্য ধার্য না করায় বাধ্য হয়ে চাষীরা লোকসানে ধান বিক্রি করছে। তাছাড়া রাজ্য সরকার ও এফ সি আই সরাসরি চাষীদের কাছ থেকে ধান না কিনে মিল মালিকদের কাছ থেকে চাল কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে — সেটা পরিমাণেও খুবই নগণ্য।

আটের পাতায় দেখুন

ইংরাজির দাবিতে শিশু মিছিল

হাজার হাজার শিশুকে আবার রাস্তায় নেমে চিৎকার করে দাবি করতে হল ঃ প্রথম শ্রেণী থেকে আমাদের ইংরাজি পড়াও, পাশ-ফেল চালু কর, চতুর্থ শ্রেণীতে বৃত্তি পরীক্ষা চালু কর। তাদের সঙ্গে ছিলেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। তারা নিয়ে গিয়েছিল লক্ষ লক্ষ অভিভাবকের স্বাক্ষর, তাদের দাবির সমর্থনে। বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বে গত ১২ ডিসেম্বর শহীদ মিনার থেকে রানি রাসমণি রোডের সভায় তারা গিয়েছিল মিছিল করে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌রাও এই সভায় উপস্থিত থেকে এই আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছেন।

গণস্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে ঃ দীর্ঘ গণআন্দোলনের চাপে দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে ইংরাজি চালু হয়েছে। কিন্তু প্রথম শ্রেণীতে তা চালু করার সরকারি সিদ্ধান্ত ঘোষণা না করে এখনও নানাভাবে টালবাহানা করে বিষয়টাকে ধামাচাপা দেওয়ার অপচেষ্টা চলছে। পাশ-ফেল প্রথা না থাকার ফলে যোগ্যতা বা মান বিচার হচ্ছে না, পরিণতিতে শিক্ষার মানের চরম অবনমন ঘটছে। বেসরকারি উদ্যোগে আয়োজিত বৃত্তি পরীক্ষার বিপুল জনপ্রিয়তা প্রমাণ করছে — এই ব্যবস্থার প্রতি সাধারণ মানুষের আকর্ষণ কতখানি।

এই দিনের সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন সরকার এইভাবে টালবাহানা করে সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। শিক্ষার স্বার্থে অবিলম্বে প্রথম শ্রেণী থেকে ইংরাজি এবং পাশ-ফেল ও বৃত্তি পরীক্ষা প্রবর্তনের দাবি অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল বলেন ২৬ বছরের শাসনে শিক্ষায় এ রাজ্য ক্রমাগত পিছিয়ে পড়েছে, সঙ্কীর্ণ রাজনীতি শিক্ষাক্ষেত্রকে কলুষিত করছে। শিক্ষা তথা জনজীবনের স্বার্থে অবিলম্বে দাবি মেনে নেওয়ার জন্য তিনি সরকারের কাছে আবেদন রাখেন।

সমিতির সাধারণ সম্পাদক কার্ত্তিক সাহা সরকারি ভ্রান্ত নীতির কঠোর সমালোচনা করে বলেন যদি আসন্ন শিক্ষাবর্ষে সরকার জনগণের ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলি না মানেন — তাহলে আন্দোলন আরও তীব্র আকার ধারণ করবে। তিনি দলমত নির্বিশেষে সমগ্র শিক্ষক সমাজসহ সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহবান জানান।

১২ ডিসেম্বর শিশুদের সভায় বক্তব্য রাখছেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী সুশীল কুমার মুখার্জী

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র

বীরভূম জেলা সম্মেলন

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর ৪র্থ বীরভূম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ২৯-৩০ নভেম্বর মুরারই শহরে। সম্মেলনস্থল 'শহীদ মুজিবর রহমান নগর' নামে নামাঙ্কিত হয়েছিল। এই সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় বেলা ২টায় মুরারই বাস স্ট্যান্ড মাঠে। এখানে বাস শ্রমিকদের সহযোগিতা অভিনন্দনযোগ্য। প্রকাশ্য সমাবেশে সহস্রাধিক মানুষ সমবেত হন। অসুস্থতার জন্য অনুপস্থিত রাজ্যের বিশিষ্ট শ্রমিকনেতা কমরেড জিয়াদ বক্সীর পরিবর্তে সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড ব্রজমোহন দাস। কমরেড মধু সিন্‌হা ও কমরেড মহম্মদ আমিনের মৃত্যুতে সভায় নীরবতা পালন করা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন কমরেড রফিকুল হাসান ও বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য। সভার প্রধান বক্তা ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর সর্বভারতীয় কমিটির সহ-সভানেত্রী কমরেড প্রতিভা মুখার্জী, তাঁর ভাষণে পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের সর্বাত্মক আক্রমণে এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির ফলে শ্রমজীবী মানুষ কিভাবে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আদর্শগত জীবনে অত্যন্ত কঠিন ও গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তা বিশ্লেষণ করে দেখান। এই আক্রমণ প্রতিরোধে এ যুগের মহান মার্কসবাদী দার্শনিক ও সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর রাজ্য জুড়ে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টাকে শক্তিশালী করার আহবান জানান তিনি।

৩০ নভেম্বর কমরেড ব্রজমোহন দাসের সভাপতিত্বে প্রতিনিধি সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। শোক প্রস্তাব পাঠ করেন কমরেড সিরাজউদ্দৌল্লা ও সমর্থন করেন কমরেড মঙ্গল হেমব্রম। সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সম্পাদক কমরেড রফিকুল হাসান সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন। কমরেড প্রতিভা মুখার্জী ও কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য প্রতিনিধি সম্মেলনেও বক্তব্য রাখেন। কমরেড জিয়াদ বক্সীকে সভাপতি এবং কমরেড রফিকুল হাসানকে সম্পাদক করে ৩২ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

বক্তব্য রাখছেন কমরেড প্রতিভা মুখার্জী

চা শ্রমিকদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জ

একের পাতার পর

তোয়াক্কা না করে শ্রমিকদের প্রাপ্য আত্মসাৎ করেছে। দিনের পর দিন এসব কথা খবরের কাগজে এসেছে, বিধানসভায়ও উঠেছে — তবু মালিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি সি পি এম সরকার। কিন্তু শ্রমিক যেদিন প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে সেদিনই আইনশৃঙ্খলা রক্ষার নামে নেমে এসেছে পুলিশি জুলুম। কারণ এ সরকার 'আইনশৃঙ্খলা রক্ষা' করে মালিকদের স্বার্থে, শ্রমিকের স্বার্থে নয়।

১০ ডিসেম্বরের মিছিলের রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল বিরাট। অসহায় শ্রমিক মুখ বুজে মার খাবে, নয়ত 'প্রতিবাদ' করবে মালিকের গোলাম দলগুলির নেতৃত্বে। আন্দোলনের নামে তাদের ক্ষোভের বাষ্পকে নিরাপদে বের করে দেবে মালিকের পোষা ইউনিয়নগুলি। এই প্রচলিত ছকের বাইরে এসে এস ইউ সি আই -এর নেতৃত্বে প্রতিবাদী শ্রমিকদের মূল দাবি ছিল বন্ধ বাগান অবিলম্বে খুলতে হবে; পি এফ দিতে হবে; রেশন, জ্বালানি সরবরাহ এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে। এর রাজনৈতিক তাৎপর্য বুঝতে অসুবিধা হয়নি সি পি এম নেতৃত্বের। বিপ্লবী নেতৃত্বে শ্রমিক জেগে উঠে বুঝে নিক তার শক্তি কত — এ চায়নি সরকার। মিছিল যত এগিয়েছে পথের দুপাশে শ্রমিক জনতার বুকের ব্যথা উল্লাস হয়ে ফেটে পড়েছে প্রতিবাদে। ধিক্কার দিয়েছে মানুষ।

ডি এস পির নেতৃত্বে প্রচুর পুলিশ হাজির ছিল। তিনটি বৃত্ত করে তারা ঘিরে পেটানোর জন্য তৈরি ছিল। হাজার হাজার শ্রমিকের মিছিলে শ্রমিক পরিবারের নারী ও শিশুরা ছিল সংখ্যায় অনেক। মিছিল আদালত চত্বরে ঢোকামাত্র ধিক্কৃত সি পি এম সরকার ও প্রশাসন জবাব দিয়েছে লাঠি চালিয়ে। মারাত্মক আহত হয়ে লুটিয়ে পড়েন সুবল রায়, মহেন রায়, সুকুমার শ্যাম, সঞ্জয় বিশ্বাস, উদয় কুণ্ডু, রাম ওঁরাও, গুন্দু ওঁরাও, শিবরাম ওঁরাও। মহেন রায় ও সুবল রায়কে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। টি পি ই ইউয়ের সাধারণ সম্পাদক তপন ভৌমিক সহ গোপী ছেত্রী, কাজি লামা, জ্যোৎস্না রায়, রবি ঘোষ, কমল ওঁরাও, রামপ্রতাপ বরাইক প্রমুখকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ১১ ডিসেম্বর পুলিশি জুলুমের প্রতিবাদে উত্তরবঙ্গে প্রতিবাদ দিবস পালন করা হয়।

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর বিবৃতি

গত ১০ ডিসেম্বর শিলিগুড়িতে চা শ্রমিকদের উপর পুলিশের লাঠি চালনার তীব্র নিন্দা করে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়েছেন —

"উত্তরবঙ্গের বন্ধ চা-বাগানগুলি অবিলম্বে খোলার দাবিতে এবং বন্ধ বাগানের শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনীয় রেশন, বিদ্যুৎ, জল, চিকিৎসা পরিষেবা ইত্যাদি কর্তৃপক্ষ বন্ধ করে দেওয়ায় এবং রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেওয়ার ফলে শয়ে শয়ে শ্রমজীবী মানুষের অসহনীয় অবস্থার প্রতিকারের দাবিতে ১০ ডিসেম্বর এস ইউ সি আই দল ও ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী অনুমোদিত নর্থবেঙ্গল টি প্ল্যানটেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন এর ডাকে শত শত শ্রমিক-কর্মচারী ও সাধারণ মানুষ শিলিগুড়ি এস ডি ও কোর্ট চত্বরে আইন অমান্য করতে এলে পুলিশ বিনাপ্ররোচনায় শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল আইন অমান্যকারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ও বেপরোয়া লাঠিচার্জ করে। ৫০ জনেরও বেশি গুরুতর আহত হয়। অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ২৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ইউ টি ইউ সি লেনিন সরণীর পক্ষ থেকে আমরা পুলিশের বেপরোয়া লাঠিচালনার তীব্র নিন্দা করছি এবং দোষী পুলিশদের শাস্তি ও আহতদের উপযুক্ত চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণের দাবি জানাচ্ছি। এই নৃশংস ঘটনার প্রতিবাদে ১১ ডিসেম্বর উত্তরবঙ্গে যে প্রতিবাদ দিবস পালনের ডাক দেওয়া হয়েছে তাকে সফল করার জন্য আমরা সর্বস্তরের শ্রমিক কর্মচারীদের আহবান জানাচ্ছি।"

পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন
সিপিএম-ফ্রন্ট সরকার শ্রমিকদের ক্রীতদাস বানাতে চায়

শ্রমিকদের ন্যূনতম স্বার্থ ও অধিকারকে বলি দিয়ে নির্লজ্জ মালিকতোষণে সি পি এম ফ্রন্ট সরকার আজ আর কোন রাখ-ঢাক রাখছে না। রাজ্য সরকার এতদিন মালিকশ্রেণীর যাবতীয় জুলুম চলতে দিয়েছে, কোনও বাধা দেয়নি, বরং বাধা দিয়েছে শ্রমিকদের। এখন সরকার নিজেই আইন করে শ্রমিকদের অর্জিত অধিকারগুলির সাথে আন্দোলনের অধিকারকেই কেড়ে নিচ্ছে। সি পি এম তথা বামফ্রন্টের নেতারা যখন শ্রমিকদের সভায়, সাধারণ মানুষের সভায় উঠতে বসতে কেন্দ্রের বিশ্বায়ন-বেসরকারীকরণ নীতিকে গালমন্দ করছেন, চেন্নাইয়ে সিটুর সর্বভারতীয় সম্মেলনে অগ্নিবর্ষী ভাষায় বিশ্বায়নের নীতিকে নিন্দা করা হচ্ছে, ঠিক তখনই ৯ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় *'দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্পেশাল ইকনমিক জোন বিল ২০০৩'* পাশ করিয়ে নেওয়া হল। কেন্দ্রীয় সরকারের মতই ফ্রন্ট সরকারেরও অজুহাত এক্ষেত্রে শিল্পায়ন। রপ্তানিমুখী শিল্প গড়ে তোলার নামে এই বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলিতে মালিকদের দেওয়া হচ্ছে অবাধ ক্ষমতা, যা শ্রমিক-কর্মচারীদের ওপর তারা প্রয়োগ করতে পারবে। শুধু তাই নয়, এই অঞ্চলগুলিতে শিল্প গড়ে তুলতে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারই মালিকদের দিচ্ছে বিপুল পরিমাণ কর ছাড়। কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে বহিঃশুল্ক, অন্তঃশুল্ক, বিক্রয়কর ছাড় এবং আগামী পাঁচ বছরের জন্য আয় করেও ছাড়। এর উপর রাজ্য সরকার বিদ্যুৎ শুল্ক সহ বিভিন্ন রকম কর, সেস প্রভৃতি মকুব করার কথা ঘোষণা করেছে। বিপরীতে শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য প্রচলিত আইনে যতটুকু সুযোগ ও অধিকার আছে, তাও রাখা হবেনা এইসব শিল্পাঞ্চলে কাজ-করা শ্রমিকদের জন্য। ধর্মঘট করতে হলে বহুদিনের আগাম নোটিস দেওয়ার কথা আইনে বলা হলেও, শিল্পমন্ত্রী বলে দিয়েছেন, এই বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলিতে শ্রমিকদের ধর্মঘট তাঁদের কাম্য নয়, অর্থাৎ ধর্মঘট কার্যত নিষিদ্ধ। এমনিতেই যখন আজ কলে কারখানায় মালিকদের একতরফা আক্রমণের সামনে শ্রমিকরা পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে, 'প্রতিবাদ করলে, ধর্মঘট করলে কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে' এই অজুহাতে সিটু সহ সরকারি শ্রমিক সংগঠনগুলি সর্বত্রই মালিকদের শর্ত শ্রমিকদের নতজানু হয়ে মেনে নিতে বলছে, তখন এই 'বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের' শ্রমিকদের কপালে কী জুটবে, তা বোঝা দুঃসাধ্য নয়।

সি পি এম-এর মুখপত্র 'গণশক্তি' (১০-১২-০৩) লিখেছে, বিশেষ অঞ্চলগুলির জন্য রাজ্য সরকার যে আইন প্রণয়ন করছে তা কেন্দ্রের বিজেপি পরিচালিত জোট সরকারের নির্দেশিকা মেনেই। ভাবখানা হল, যেন কেন্দ্রের নির্দেশ মেনে এমন আইন করতে রাজ্য সরকার বাধ্য। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যাচার। এমন কোনও বাধ্যতা রাজ্য সরকারের নেই। একইভাবে 'বিদ্যুৎ আইন ২০০৩', যার বিরুদ্ধে সি পি এম নাকি জোরদার আন্দোলন করছে বলে দাবি করছে, সেই আইনও পুরোপুরি কার্যকর করা হবে ঐ বিশেষ অঞ্চলে। যার অর্থ হল — শিল্পমালিকরা কম দামে বিদ্যুৎ পাবে। সমগ্র অঞ্চলটি দেখভালের দায়িত্বে থাকবেন একজন বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন 'ডেভেলপমেন্ট কমিশনার'। শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার প্রশ্নে শিল্পবিরোধ আইন কার্যকর থাকার কথা বলা হলেও তা প্রয়োগ করার ক্ষমতা থাকবে সরকার নিয়োজিত ঐ কমিশনারের হাতেই এবং কোনও বিরোধ নিয়ে শ্রমিকরা ট্রাইবুনাল বা আদালতে যেতে পারবে না। এভাবেই শ্রমিকদের ক্রীতদাস বানাবার পাকা ব্যবস্থা করে দিল সি পি এম ফ্রন্ট সরকার। এর অর্থ এইসব অঞ্চলের শিল্প বা সংস্থার দেশি-বিদেশি মালিকরা যেমন খুশি কম মজুরিতে, যেমন খুশি শর্তে ও যত বেশি ঘণ্টা পারে শ্রমিকদের ক্রীতদাসের মত পরিশ্রম করিয়ে মুনাফা লুটবে এবং সি পি এম ফ্রন্ট সরকার তাকেই বলবে উন্নয়ন। সংবাদে প্রকাশ এই অঞ্চলের পরিকাঠামো তৈরি ও বিকাশের দায়িত্ব বেসরকারি সংস্থা বা কোন ব্যবসায়ীকে দেওয়া হবে — যাদের পোষাকি নাম 'ডেভেলপার'। এরাও জমির 'উন্নয়ন' ও 'বিক্রিতে' লুট করবে বিপুল টাকা।

ইতিমধ্যেই ফ্রন্ট সরকার সল্টলেকের 'মণিকাঞ্চন' এবং ফলতা মুক্ত বাণিজ্য কেন্দ্রকে 'বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল' হিসাবে ঘোষণা করেছে। কুলপি শিল্পাঞ্চল ও বানতলা চর্মনগরী সম্পর্কেও তাদের ভাবনা একই। সরকারের এই পদক্ষেপের প্রশংসায় মালিকশ্রেণী পঞ্চমুখ। ইতিমধ্যেই চটকল মালিকরা চটশিল্পে এই আইন প্রয়োগ করার জন্য সরব হয়েছে।

বিধানসভায় ওয়াকআউট

বিধানসভায় এস ইউ সি আই পরিষদীয় নেতা কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার বলেন, সি পি এম ফ্রন্ট সরকারের রাজত্বে এটি একটি নজিরবিহীন কালা বিল।

একদিকে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ, বিশ্বায়ন তথা নয়া শিল্প ও আর্থিক নীতির বিরুদ্ধতা করছেন বলে দাবি করছে। এমন কী গত ৫ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভাতেই বিশ্বায়নের বিরোধিতা করে একটি প্রস্তাবও গ্রহণ করেছে, অথচ কার্যক্ষেত্রে সেই নীতি রূপায়িত করতে ফ্রন্ট সরকার যে কত তৎপর, আজ শিল্পমন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত এই বিলটিই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। বিলের প্রতিবাদে তিনি বিধানসভা থেকে ওয়াকআউট করেন।

শ্রমিকদের নিদারুণ দুর্দশায় এবং মালিকী আক্রমণে রাজ্যের শ্রমদপ্তর নীরব দর্শক কেন?
অবস্থান-বিক্ষোভ থেকে চটকল শ্রমিকদের ক্ষুব্ধ প্রশ্ন

গত ১০ ডিসেম্বর কোলকাতার নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংসে রাজ্যের শ্রম কমিশনার দপ্তরের সামনে পাঁচ শতাধিক চটকল শ্রমিক অবস্থান বিক্ষোভের কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ধ্বনিত করেছে তাদের তীব্র ক্ষোভ এবং রাজ্যের শ্রমদপ্তরের প্রতি তীব্র ধিক্কার। হুগলি জুট মিল, ইন্ডিয়া জুট মিল এবং হেস্টিংস জুট মিলের শ্রমিকরা ঐ দিন অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হন ৬টি ট্রেড ইউনিয়ন — ইউ টি ইউ সি - লেনিন সরণী, আই এফ টি ইউ, বি এম এস, এ আই সি সি টি ইউ, এন এফ আই টি ইউ এবং জুট টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের আহবানে।

১৮ আগস্ট থেকে এই ৬টি ইউনিয়নের ডাকে চটকল শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি, যেমন বকেয়া বর্ধিত ডি-এ, গ্র্যাচুইটি, পি এফ, সমকাজে সমবেতন এবং ৫-১-২০০২ এর কালাচুক্তি বাতিলের দাবিতে লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছিল। সিটু, আই এন টি ইউ সি এবং এ আই টি ইউ সি'র তীব্র বিরোধিতা, মালিক-গুণ্ডাবাহিনীর স্ট্রাইক ভাঙার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টার পরও ৩৭টি চটকলে দশ দিন সর্বাত্মক ধর্মঘট চলে। গুণ্ডাবাহিনী এবং পুলিশের সাহায্যে ধর্মঘট ভাঙতে না পেরে হুগলি জুটমিল এবং ইন্ডিয়া জুটমিলের মালিক অরুণ বাজোরিয়া ক্ষিপ্ত হয়ে ১৮ আগস্ট থেকেই ওই দুটি মিলে 'সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের' নোটিশ ঝুলিয়ে দেয় এবং পুরো মজুরিকে উৎপাদনের সাথে যুক্ত করে দিয়ে শ্রমিকদের বেতন কাটার শর্ত মিল খোলার পূর্বশর্ত হিসাবে চাপিয়ে দেয়। মালিকদের দেওয়া ঐসব শ্রমিক-মারা শর্ত না মানলে মিল দুটিকে চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিতে থাকে। ইন্ডিয়া জুটমিলের ম্যানেজমেন্ট এক অংশের শ্রমিকদের অনাহার এবং অসহায়তার সুযোগ নিয়ে পুরো মজুরিকে শর্তাধীন করে উৎপাদন ভিত্তিক বেতন চালু করার এক গোপন চুক্তি করে মিল খুলে দিয়েছিল। কিন্তু সচেতন শ্রমিকদের প্রতিরোধের ফলে ওই চুক্তিটি কার্যকরী হতে পারেনি এবং মালিক আবার মিল বন্ধ করে দেয়।

হুগলি জুটমিল এবং ইন্ডিয়া জুটমিলের হাজার হাজার শ্রমিক আজ চরম দুরবস্থার মধ্যে অনাহার-অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। নারী-শিশু-বৃদ্ধ সহ সাধারণ মানুষ যখন শ্বাসরোধকারী অবস্থার মধ্যে ধুঁকছে তখন একদিকে মালিক অরুণ বাজোরিয়া চরম ঔদ্ধত্যে ঘোষণা করছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার চূড়ান্ত বেআইনি শর্তগুলি না মানা হবে ততক্ষণ তার শ্রমিক নির্যাতন বা 'লিঞ্চিং' চলবে। অন্যদিকে রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী এবং শ্রমদপ্তর সমস্ত জেনেশুনে এবং শ্রমিকদের অভিযোগ পাওয়ার পরও ঠুঁটো জগন্নাথের মতো বসে রয়েছেন। তারা কোনও বৈঠকও ডাকছেন না বা হস্তক্ষেপও করছেন না। হেস্টিংস্ জুটমিলের মালিক বর্তমানে আই জে এম এ-র সভাপতি সঞ্জয় কাজারিয়া ১৮ আগস্টে লাগাতার হরতালে অংশগ্রহণ করার জন্য ধর্মঘটকারী ইউনিয়ন নেতাদের উপর চার্জশিট এবং সাসপেনশনের হুকুম জারি করেছেন। ওই ধর্মঘট বেআইনি ছিল বলে হাইকোর্টেও তিনি কেস করেছেন। বর্তমানে হাইকোর্ট থেকে ট্রাইবুনালে বিষয়টি রয়েছে। প্রশ্ন হল, বিষয়টি যখন ট্রাইবুনালের বিচারাধীন তখন কীভাবে ধর্মঘট করার 'অপরাধে' কারখানায় শান্তি বহাল রেখে, এমনকি মানেজমেন্ট 'ডোমেস্টিক ইনকোয়ারি'-র মধ্যে যাচ্ছে এবং ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী সহ অন্যান্য ইউনিয়ন নেতৃত্বকে মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসাবার ষড়যন্ত্র করছে?

অবস্থান থেকে তাই প্রশ্ন ওঠে যে, মালিকরা এমন বেআইনি কাজকর্ম করা সত্ত্বেও সরকার কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না কেন? সরকারের নীরবতা কি মালিকদের এই অমানবিক কাজকেই প্রশ্রয় দিচ্ছে না? তাহলে সরকার থাকার প্রয়োজন কী? সরকার অরুণ বাজোরিয়াকে রাণীগঞ্জের মঙ্গলপুরে ২৫০ টন উৎপাদনের একটি মিল — যে মিলটিতে ৪০/৫০ টাকা দৈনিক মজুরিতে শ্রমিক নিযুক্ত হচ্ছে, চালাবার অনুমতি দিয়ে পূর্ণ মজুরির পুরাতন মিলগুলি তুলে দেবার ব্যবস্থা করছে না কি? শ্রমিকদের এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারেননি শ্রমকমিশনার। পশ্চিমবঙ্গে মালিকশ্রেণী যেভাবে আইনের বিন্দুমাত্র পরোয়া না করে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তথাকথিত বামফ্রন্ট সরকার থাকতে মালিকদের এই ঔদ্ধত্য এল কোথা থেকে ?

অবস্থান-বিক্ষোভে ইউ টি ইউ সি -লেনিন সরণীর নেতা এবং বেঙ্গল জুটমিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য, আই এফ টি ইউ নেতা কমরেড পল্টু সেন, এ আই সি সি টি ইউ নেতা কমরেড অতনু চক্রবর্তী, বি এম এস নেতা আনন্দী সাউ, এন এফ আই টি ইউ নেতা হারাধন দাস বক্তব্য রাখেন। শ্রমকমিশনার ১০ দিনের মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করার আশ্বাস দিলে অবস্থান শেষ হয়।

বাঁকুড়া জেলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সম্মেলন

২ ডিসেম্বর বাঁকুড়ার মাচানতলায় বিদ্যুৎ গ্রাহকদের দ্বিতীয় জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট আইনজীবী দিগ্বিজয় সিংহ। প্রায় দুই শতাধিক প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

মূল্যবৃদ্ধি, সেসবৃদ্ধি, লোডশেডিং-এ জর্জরিত বিদ্যুৎ গ্রাহকদের উপর 'বিদ্যুৎ আইন ২০০৩'-এর আক্রমণ প্রতিরোধের দাবিসহ সাংগঠনিক রিপোর্টটি পড়ে শোনান জেলা সম্পাদক স্বপন নাগ। রিপোর্টের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন সহ সম্পাদক জয়দেব কর ও সহসভাপতি কমলাকান্ত কর্মকার। প্রধান অতিথি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক লীলাময় মুখোপাধ্যায় 'বিদ্যুৎ আইন ২০০৩'র ভয়াবহ দিকগুলি তুলে ধরে বলেন — বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ঐক্যবদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন ছাড়া এ সমস্যার সমাধান হবে না। বিশিষ্ট নাগরিক শিবপ্রসাদ দরিপা বিদ্যুৎ গ্রাহক-দের যন্ত্রণাময় দিকগুলি তুলে ধরেন। প্রধানবক্তা সমিতির রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস আকস্মিকভাবে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় উপস্থিত থাকতে পারেননি। সভায় উপস্থিত রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অমল মাইতি রাজ্যব্যাপী গ্রাহক আন্দোলনের ধারাবাহিক জয়ের দিকগুলি ও আগামী দিনে গ্রাহক সমাজের করণীয় কাজগুলির রূপরেখা তুলে ধরেন। আগামী ২০-২১ ডিসেম্বর রাজ্য সম্মেলনকে সফল করার জন্য তিনি আহবান জানান। সভাপতির ভাষণের মধ্য দিয়ে সভা শেষ হয়।

বিদ্যুৎ আইন ২০০৩
রাজ্য সরকার প্রয়োগ বন্ধ রাখতে পারে

একের পাতার পর

দেওয়ার জন্যই ক্যাপ্টিভ উৎপাদনকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে সব থেকে বেশি।

মাশুল নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি হিসাবে যে প্রতিযোগিতার কথা বলা হয়েছে, তা আকাশকুসুম ছাড়া কিছুই নয়। বিশ্বের কোথাও আজ আর সুস্থ প্রতিযোগিতা নেই। যতটুকু প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা বিদ্যুৎ শিল্পে রয়েছে তার সুবিধাটুকুও পাবে বৃহৎ শিল্প এবং বহুজাতিক সংস্থাই। লগ্নীকারীরা ইতিমধ্যেই এই প্রতিযোগিতার কথা বলে কর্মী সংকোচনের পথ গ্রহণ করেছে।

সকলেই জানেন, প্রতিযোগিতার জুজু আর দাম কমানোর টোপ দেখিয়ে সি ই এস সি ইতিমধ্যে ৪৩৭২ জন শ্রমিক কর্মচারীকে জবরদস্তি অবসরগ্রহণে বাধ্য করার ব্যবস্থা করেছে। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদেরও একই পরিকল্পনা রয়েছে। রাজ্য সরকার দর্শকের ভূমিকায় অভিনয় করে চলেছে।

১৯৯১ সালে কেন্দ্রীয় সরকার খোলা বাজার অর্থনীতি গ্রহণ করেছে যার মৌলিক অর্থ হল সব কিছুই বাজারের পণ্য। সেই নীতি অনুযায়ী, আইনে যাই থাক না কেন, বাস্তবে ধীরে ধীরে বিদ্যুৎ শিল্পে বাণিজ্যিকীকরণ ও বেসরকারীকরণের কাজ ১৯৯১ থেকে শুরু হয়েছিল। ১৯৯৮ সালে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন আইন চালু করে, পারস্পরিক ভরতুকি নামক একটি বিভ্রান্তিকর কথা বাজারে আমদানি করে অভিন্ন মাশুল চালু করার চেষ্টা চালানো হয়েছে। এর প্রকৃত উদ্দেশ্য হল, গরিব, মধ্যবিত্তর ক্ষেত্রে দাম বাড়িয়ে সেই টাকায় বৃহৎ শিল্প এবং বহুজাতিক সংস্থাকে ভরতুকি দেওয়া।

কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের এই খোলা বাজার অর্থনীতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বিদ্যুৎনীতির ফলেই বিগত ১০-১২ বছরে বিদ্যুতের দাম বেড়েছে প্রায় ২০ গুণ। পশ্চিমবঙ্গ মাশুল বৃদ্ধিতে ভারতবর্ষের মধ্যে প্রায় শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। বাজার অর্থনীতিকে বিদ্যুৎ শিল্পের মধ্যে পূর্ণাঙ্গভাবে রূপ দেওয়া হয়েছে 'বিদ্যুৎ আইন ২০০৩'-এ।

সাধারণ মানুষের টাকায় তৈরি বিদ্যুৎ পর্ষদকে বেসরকারি লগ্নীকারীদের হাতে তুলে দিয়ে লগ্নীকারীদের পৃষ্ঠপোষকতা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে বর্তমান আইনে।

এই আইনটি ২০০১ সালে বিল আকারে লোকসভায় পেশ, ২০০৩ সালে আইনে পরিণত হওয়া এবং তার পরে ৬ মাস অতিবাহিত হওয়ার পরেও কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলি মৌখিক প্রতিবাদ ছাড়া এই সর্বনাশা আইনটি বাতিলের জন্য কোন কার্যকরী ভূমিকা নেয়নি। উপরন্তু নিজ নিজ রাজ্যে দ্রুত এই জনস্বার্থ বিরোধী আইনকে রূপ দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমিকা আরো উদ্বেগজনক। কারণ দীর্ঘদিন ধরে এই সরকার সি ই এস সি নামক বেসরকারি কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতা করে চলেছে। এই কারণেই সি ই এস সি-র মতো রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকে কোম্পানিতে পরিণত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সি ই এস সি-র কাছে পাওনা প্রায় ৯০০ কোটি টাকা এখনও আদায় করছে না। উপরন্তু জনগণের উপর মাশুলের বোঝা বৃদ্ধি এবং পর্ষদের লোকসান বাড়িয়ে এ বছরও ২০৪ কোটি টাকা সি ই এস সি-কে মকুব করে দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার খুব ভালো করে জানে যে এই আইন কার্যকর হলে লাগামহীনভাবে বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি পাবে। তার ফলে একদিকে সমস্ত জিনিসপত্রের দাম বাড়বে, অপরদিকে ক্ষুদ্র কৃষক জমি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হবে। ক্ষুদ্র শিল্প এবং ব্যবসা বন্ধ হতে থাকবে। যে গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি, সেখানে কোনদিন বিদ্যুৎ পৌঁছাবে না। যেখানে পৌঁছেছে সেখানে সাধারণ মানুষ সংযোগ ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে। বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পাবে।

এসবের ফলে জনগণের মধ্যে যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে এবং প্রবল আন্দোলনের জোয়ার তৈরি হবে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেই আন্দোলনের ধাক্কা থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য এবং নিজের ভোটের বাজার চাঙ্গা করার জন্য প্রচার করছে, শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের আইনের জন্যই এসব হচ্ছে। অথচ বিদ্যুৎ যুগ্মতালিকাভুক্ত। সেই নিয়ম অনুযায়ী জনস্বার্থ বিরোধী আইনটিকে দ্রুত পশ্চিমবঙ্গে কার্যকর করার জন্য সিপিএম সরকার রিস্ট্রাকচারিং কমিটি ও বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছে এবং রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকে একদিকে বিভক্ত করা অন্যদিকে কোম্পানিতে পরিণত করার কাজ ইতিমধ্যেই সেরে ফেলেছে।

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারে অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলি প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় ধনকুবের গোষ্ঠী এবং বহুজাতিক সংস্থাগুলির করুণার ভিত্তিতে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যই এত বড় জনস্বার্থবিরোধী আইনটিকে অনুমোদন দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এর ব্যতিক্রম নয়, বরং অগ্রণীদের মধ্যে অন্যতম।

প্রথমত, ১৮০ ও ১৮২ নং ধারা অনুযায়ী এই আইনকে কার্যকর করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের, এর জন্য রুলস ও রেগুলেশন তৈরি করার দায়িত্বও রাজ্য সরকারের।

দ্বিতীয়ত, ১৭২ নং ধারায় স্পষ্টই বলা হয়েছে যে, রাজ্য সরকার মনে করলে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে এক বছরের সময়সীমার অতিরিক্ত সময়ও বিদ্যুৎ পর্ষদকে ট্রান্সমিশন ইউটিলিটি অথবা লাইসেন্সি হিসাবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিতে পারে।

তৃতীয়ত, ১০৮ নং ধারায় বলা হয়েছে, রাজ্য সরকার নীতিগতভাবে অর্থাৎ কোন বিষয়ের সঙ্গে জনস্বার্থ যুক্ত রয়েছে এই যুক্তিতে, কোন লিখিত রিপোর্ট দিলে বা নির্দেশ দিলে কমিশনকে তা মেনে চলতে হবে। এই বিষয় নিয়ে কোন প্রশ্ন দেখা দিলে রাজ্য সরকারের নির্দেশই শেষ কথা বলে বিবেচিত হবে বলে আইনে বলা হয়েছে।

সুতরাং রাজ্য সরকার যদি সততার সাথে বর্তমান আইনের প্রয়োগ বন্ধ করতে চায়, অবিলম্বে উপরোক্ত তিনটি ধারা প্রয়োগ করে এই সর্বনাশা বিদ্যুৎ আইন প্রয়োগ বন্ধ রেখে আন্দোলনকে তীব্রতর করে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর আইনটি প্রত্যাহারের জন্য চাপ সৃষ্টি করতে পারে। সকলেই জানেন, রাজ্য সরকার সে কাজ না করে মিথ্যা প্রচার করে একদিকে জনগণকে বিভ্রান্ত করার, অন্যদিকে আইনটিকে দ্রুত কার্যকর করার পথ গ্রহণ করেছে।

পশ্চিমবঙ্গই একমাত্র রাজ্য যেখানে বিদ্যুতের সমস্ত ভরতুকি তুলে দেওয়া হয়েছে। 'অ্যাবেকা' রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে বিদ্যুতে ভরতুকি ঘোষণা করার দাবি জানিয়েছে।

সংবাদে প্রকাশ, রাজ্য সরকার জনসাধারণের উপর নতুন করে সেস্ বসিয়ে সুন্দরবনে বিদ্যুতায়ন করার পরিকল্পনা নিয়েছে। 'অ্যাবেকা'র নেতৃবৃন্দ বলেন, আমরা এই সেস্ চালু করার তীব্র বিরোধিতা করছি এবং সরকারি ভরতুকির মাধ্যমে সুন্দরবনে বিদ্যুতায়নের দাবি জানাচ্ছি। সি ই এস সি, ভি-আর-এস চালু করে কর্মী সংকোচনের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা বাতিল করার জন্য রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি করছি।

তাঁরা বলেন, বিদ্যুৎ পর্ষদের প্রচুর ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও সি ই এস সি-র কাছে পাওনা টাকা আদায়ের ব্যবস্থা না করে ২০০৩ সালের ২০৪ কোটি টাকা সি এস সি-কে মকুব করে দেওয়ার তীব্র নিন্দা করছি। আমরা মনে করি, সরকার যে পরিকল্পিতভাবে পর্ষদকে তুলে দিতে চায়, এ ঘটনা তারই প্রমাণ। সাংবাদিক সম্মেলনে যে দাবি ও কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়, তা হল—

দাবি —

১। অবিলম্বে রাজ্য সরকারকে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ প্রত্যাহারের জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করে প্রধানমন্ত্রীর কাছে সর্বদলীয় ডেপুটেশন দিতে হবে,

২। অবিলম্বে বর্তমান আইনের ১০৮, ১৭২, ১৮০ ও ১৮২ নং ধারা প্রয়োগ করে জনস্বার্থ বিরোধী বিদ্যুৎ আইন প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে,

৩। সি ই এস সি এবং বিদ্যুৎ পর্ষদে ভি-আর-এস চালু করে কর্মী সংকোচন বন্ধ করতে হবে,

৪। রাজ্য সরকারকে বিদ্যুতে ভরতুকি ঘোষণা করতে হবে,

৫। সেস্ আদায়ের পরিকল্পনা ত্যাগ করে ভরতুকি দিয়ে রাজ্য সরকারকে সুন্দরবনে বিদ্যুতায়ন করতে হবে,

৬। সি ই এস সি-সহ বৃহৎ শিল্পের বকেয়া ঘোষণা করতে হবে এবং এক মাসের মধ্যে তা আদায় করতে হবে,

৭। হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী ফুয়েল সারচার্জের ইউনিট প্রতি ৯ পয়সা ফেরত দিতে হবে এবং

৮। অভিন্ন হারে পর্ষদে ইউনিট প্রতি ৫২ পয়সা এবং সি ই এস সি-তে ২৫ পয়সা আদায় বন্ধ করতে হবে।

কর্মসূচি —

১। ১০ লক্ষ স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান,

২। সংগৃহীত স্বাক্ষর নিয়ে জানুয়ারি মাসে মহাকরণ অভিযান,

৩। ২০ - ২১ ডিসেম্বর বিদ্যুৎ গ্রাহক সম্মেলন।

৪। জানুয়ারি মাসে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের অফিসে বিক্ষোভ এবং

৫। ফেব্রুয়ারি মাসে জেলায় জেলায় আইন অমান্য আন্দোলন।

সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের
দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সম্মেলন

সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের রাজ্য সম্মেলনের প্রস্তুতি পর্বে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ৩ ডিসেম্বর। ৭৫ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সম্মেলনে আলোচ্য বিষয় ছিল পণপ্রথা, নারীনির্যাতন, নারীপাচার, গণধর্ষণ, নারীর নিরাপত্তা, সংস্কৃতির উপর বিশ্বায়নের আক্রমণ, সাম্প্রদায়িকতা, শিক্ষায় ফি বৃদ্ধি, হাসপাতাল ও বিদ্যুতের চার্জবৃদ্ধি ইত্যাদির বিরুদ্ধে এবং প্রতি গ্রাম ও শহরে মাতৃসদন ও শিশু চিকিৎসালয় খোলা, সমকাজে সম মজুরির দাবিতে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা।

সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্যা প্রণতি ভট্টাচার্য। এই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে কমরেড কৃষ্ণা মহন্তকে সভানেত্রী এবং বাবলী বসাককে সম্পাদিকা নির্বাচিত করে মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটি গঠিত হয়।

২০ - ২১ ডিসেম্বর

অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে

সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সম্মেলন

প্রকাশ্য সমাবেশ ঃ ২০ ডিসেম্বর, বিকাল ৪টা

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিকী হল

উদ্বোধক **- প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্যামল কুমার সেন**

বক্তা - প্রাক্তন মেয়র কমল বসু, সাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ,
বিদ্যুৎ বিশেষজ্ঞ সুজয় বসু, আইনজীবী ভবেশ গাঙ্গুলি ও সঞ্জিত বিশ্বাস

প্রতিনিধি অধিবেশন ঃ ২১ ডিসেম্বর, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন

সন্ত্রাসবাদ ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

মধ্যপ্রাচ্যের দীর্ঘ ইতিহাস দেখিয়ে দেয় যে, আমেরিকা তার সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে মধ্যপ্রাচ্যে একের পর এক শক্তিকে দাবার ঘুঁটির মত ব্যবহার করেছে; একের বিরুদ্ধে অপরকে যুদ্ধে প্ররোচিত করেছে, উভয়কেই সামরিক 'সাহায্য' দিয়েছে এবং এ অঞ্চলে কোথাও কোন গণতান্ত্রিক শক্তি যাতে মাথা তুলে না দাঁড়ায় তার জন্য ছলে-বলে কৌশলে নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। একদিন যাকে সে মিত্রশক্তি হিসাবে ব্যবহার করেছে, ন্যূনতম স্বার্থ ব্যাহত হলে তাকেই পরে শত্রু হিসাবে গণ্য করেছে; সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিয়ে তার বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি ব্যবহার করেছে। এই নীতির ভিত্তিতেই বুঝতে হবে ইরাকের মত তার একটি বিশ্বস্ত মিত্র কেন প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় থেকে তার সন্ত্রাসবাদী তালিকার অন্তর্ভুক্ত হল। এ প্রসঙ্গে অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে, পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, বিশেষত আমেরিকা ইজরায়েল রাষ্ট্রকে সোভিয়েট বিরোধী তথা প্যালেস্টাইন ও আরব জাতীয়তাবাদের বিরোধী শক্তিশালী কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলেছিল। সে যাতে কখনও বিপন্ন না হয় তার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সবসময়েই সচেতন থেকেছে। যাই হোক, আট বছর বাদে যখন ইরাক-ইরান যুদ্ধ শেষ হয়, তখন ইরাকের অর্থনীতি এককথায় বিপর্যস্ত, অথচ মধ্যপ্রাচ্যে সে বৃহত্তম সামরিক বাহিনীর অধিকারী। এ অবস্থায় অর্থনীতির পুনর্গঠনের প্রয়োজনে যে বিপুল পরিমাণ অর্থের দরকার তা আসবে কোথা থেকে। ইরান যুদ্ধের পর আরব দুনিয়ায় ইরাক অনেকটা একঘরে হয়ে পড়ে। তাছাড়া সমগ্র আরব দুনিয়ায় একমাত্র সাদ্দাম হোসেনই ইসলামের পরিবর্তে একটি ধর্মনিরপেক্ষ প্রশাসন নিয়ে এসেছিলেন, তা তিনি স্বৈরতান্ত্রিক হলেও। সাদ্দাম অভিযোগ করেন যে, গোটা আরব দুনিয়া তাঁর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ করেছে এবং সাম্রাজ্যবাদ আশ্রিত কুয়েত কৌশলে সীমান্ত এলাকা দিয়ে ইরাকের তেল চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে (Slant drilling)। ফলে যে কোন আর্থিক দিক থেকে বিপর্যস্ত পুঁজিবাদী দেশের মতই সামরিকীকরণ ও তার প্রয়োজনে অন্য দেশ দখল ইরাকে অর্থনীতির একটি আভ্যন্তরীণ চাহিদা হিসাবে সৃষ্টি হয়। আমেরিকার আশঙ্কা ছিল ইরাক ইজরায়েলকে আক্রমণ করতে পারে। কিন্তু অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের আকাঙ্ক্ষায় ইরাক কুয়েত দখল করে নেয়। এইভাবে ইরাক নিজেকে বিশ্বের বৃহত্তম তেলসমৃদ্ধ দেশ হিসাবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখে। ইরাকের এই আক্রমণের পেছনে আপাতদৃষ্টিতে দুটি কারণ ছিল ঃ (১) কুয়েত কৌশলে ইরাকের তেলভাণ্ডার আত্মসাৎ করছে, (২) কুয়েত একদা ইরাকেরই একটি অঙ্গ রাজ্য ছিল। ক্রমাগত প্ররোচিত হয়ে শেষপর্যন্ত ইরাক যে কুয়েত আক্রমণ করতে যাচ্ছে, একথা সাদ্দাম আমেরিকাকে জানিয়ে দেন। আমেরিকা ভান করেছিল যেন এটা ইরাক ও কুয়েতের দ্বিপাক্ষিক সমস্যা। আমেরিকার এ ব্যাপারে করার কিছু নেই। আসলে মধ্যপ্রাচ্যে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে ইরাকের মাথা তুলে দাঁড়াবার সম্ভাবনাকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় ছিল আমেরিকা। ইরাক কুয়েত দখল করতেই সে সুযোগ এসে যায়।

১৯৯০ সালের নভেম্বরে আমেরিকার মিত্র সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির ৪,০০,০০০ সৈন্য সৌদি আরবে মোতায়েন করা হয়। এর পরের ঘটনা সকলেরই জানা। একদিকে রাষ্ট্রপুঞ্জের অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, অপরদিকে যৌথবাহিনীর আক্রমণ তথা বীভৎস বোমাবর্ষণে বিপর্যস্ত ইরাক কুয়েত থেকে পিছু হটতে বাধ্য হয়।

এভাবে ইরাক অর্থনৈতিক অবরোধ ও যুদ্ধের ফলে বিপর্যস্ত হলেও সাদ্দাম হোসেনের নেতৃত্বে তার সংহতি রক্ষা করে। পরবর্তী মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টনের সময়েও আমেরিকা যথারীতি ইরাকবিরোধী পদক্ষেপ নিয়ে চলে। এ সময় থেকেই ইরাক ও তার নেতা সাদ্দাম হোসেনকে পর্যুদস্ত করার জন্য আমেরিকা দুটি পথ নেয়। (১) মাঝে মাঝেই ইরাকি বিমান প্রতিরক্ষার ওপর আক্রমণ, (২) ইরাকে গণবিধ্বংসী অস্ত্র খোঁজার অছিলায় রাষ্ট্রসংঘের মাধ্যমে পরিদর্শক দল পাঠানো। রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের পাঠানো ১৯৯২ সালের প্রথম পরিদর্শক দলের নেতৃত্ব দেন স্কট রিটার। তারা ইরাকের প্রায় সমস্ত গণবিধ্বংসী রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্র নষ্ট করে দেয়। তারপরেও কেন এবারকার যুদ্ধের আগে আবার অস্ত্র পরিদর্শক দল পাঠাতে হল?

ইরাকে সর্বশেষ পরিদর্শক দল পাঠানোর কারণ

আসলে ইরাক আক্রমণ ও তেলভাণ্ডারের ওপর নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার যে কথা পূর্বের আলোচনায় দেখানো হয়েছিল, সেটাই দ্বিতীয়বার অস্ত্রপরিদর্শক দল পাঠানোর কারণ। কেননা পূর্বেকার অস্ত্র পরীক্ষক রিটার যে রিপোর্ট পেশ করেছিলেন, তাতে আমেরিকার পক্ষে বিশ্বজনমতকে সঙ্গে নিয়ে ইরাক আক্রমণ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাই প্রথমেই রিটারের মতামত সম্পর্কে বিশ্বজনমতকে সন্দিগ্ধ করে দিয়ে তাকে বিশ্বাসঘাতক বলে প্রচার করে, রিটার সাত বছর ধরে অস্ত্রপরীক্ষা ও ধ্বংসের যে কাজটি করেছিলেন, তাকেই নস্যাৎ করে দেওয়া হল। এরপরেই আমেরিকা বিশ্বব্যাপী প্রচারের মধ্য দিয়ে একটা বাতাবরণ সৃষ্টি করতে লাগল যে, ইরাক আমেরিকাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে; তাই আত্মরক্ষার্থে আগেই ইরাককে আক্রমণ করা নাকি আমেরিকার একটি ন্যায়সঙ্গত অধিকার। এই প্রচারকে যুক্তিসঙ্গত করার প্রয়োজনে রাষ্ট্রসংঘ মারফত আবার অস্ত্র পরীক্ষক পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেওয়ানো হল। এ প্রসঙ্গে রিটার যে কথাটি বলেছিলেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ''The hard part is determining hostile intent. How do you separate a real threat from rationalization — including one you may yourself believe — that covers your own aggressive tendencies? At that point is a pre-emptive strike justified?" (War on Iraq)। এই "rationalization" বা আক্রমণের সপক্ষে কতকগুলি বানানো যুক্তি দাঁড় করানোই আমেরিকার কূটনীতির অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় অস্ত্রপরীক্ষক দলের নেতা হান্স ব্লিক্সও এমন কোন তথ্য দেখাতে পারেননি যাতে প্রমাণ হয় যে, ইরাকের হাতে গণবিধ্বংসী অস্ত্র মজুত আছে। কিন্তু দুরাত্মার ছলের অভাব কোনদিনই হয়নি, এক্ষেত্রেও হল না। ইরাক সরকার অস্ত্র পরীক্ষক দলের সাথে ঠিকমত সহযোগিতা করছে না এবং অনেক তথ্য গোপন রাখছে এই অজুহাতে অস্ত্র পরীক্ষক দলকে ফিরিয়ে এনে, রাষ্ট্রসংঘ তথা বিশ্বজনমতকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ইঙ্গ-মার্কিন মিলিত বাহিনী একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রকে আক্রমণ করে বসল। পরে আমেরিকা ও ব্রিটেন দুদেশেই খবর বেরিয়ে যায় যে, গণবিধ্বংসী অস্ত্রের যে গল্পটি শুনিয়ে ব্লেয়ার ব্রিটেনকে এই যুদ্ধে জড়িয়ে ছিল তা ডাহা মিথ্যা।

মার্কিন কর্তাদের হাতে বন্দী শিশুরা বাগদাদের কাছে আবু খারের কারাগারের সামনে বন্দীদের প্রাপ্য অধিকারের দাবি জানাচ্ছে

ইরাকের গণবিধ্বংসী অস্ত্র সত্যই আছে কি?

এখন প্রশ্ন হল, যে গণবিধ্বংসী অস্ত্র নিয়ে এত বিতর্ক চলছে, সত্যই কি ইরাকে সে ধরনের গণবিধ্বংসী অস্ত্র মজুত আছে? এই গণবিধ্বংসী অস্ত্র বলতে বোঝানো হয়েছে চার ধরনের অস্ত্র — (১) পরমাণু অস্ত্র, (২) রাসায়নিক অস্ত্র, (৩) জীবাণু অস্ত্র, (৪) পরমাণু অস্ত্র বা অন্য প্রয়োজনে ব্যবহৃত দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র।

প্রথমত, পরমাণু অস্ত্রের বিষয়টি ধরা যাক্। ২০০২ সালের শেষের দিকে বুশ প্রশাসন, বিশেষত আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন, ইরাক দু'বছরের মধ্যেই পরমাণু অস্ত্র তৈরি করে ফেলতে পারে। পরমাণু অস্ত্র এমন নয় যে, কোন গোপন স্থানে কিছু লোক মিলিত হয়ে তা বানিয়ে ফেলতে পারে। এর জন্য চাই বিশাল পরিকাঠামো — যার জন্য চাই দীর্ঘ সময় এবং বিপুল পরিমাণ অর্থ। ১৯৯৮ সালে যখন অস্ত্র পরীক্ষক দল ফিরে আসে, তখন রাষ্ট্রসংঘ থেকে জানানো হয়েছিল যে, ইরাকে সমস্ত রকম অস্ত্র তৈরির পরিকল্পনা ও পরিকাঠামো নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে তখন কোন বিতর্ক ওঠেনি। তারপর মাত্র দু'বছরের মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে চূড়ান্ত সঙ্কটগ্রস্ত ইরাক রাতারাতি পরমাণু অস্ত্র তৈরি করে ফেলবে — এটা কি বিশ্বাস্য? দ্বিতীয়ত, এই পরিকাঠামো কি লুকিয়ে রাখা সম্ভব? তাছাড়া যে তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম দিয়ে এই পরমাণু বোমা তৈরি করা হয়, আধুনিক প্রযুক্তিতে তা অবশ্যই ধরা পড়বে। এর থেকে যে গামা রশ্মি বিকিরণ হয় তা সহজেই ধরা পড়ে। আজ পর্যন্ত কোন অস্ত্র পরীক্ষকদল এই তেজস্ক্রিয়তার প্রমাণ পাননি।

এরপর আসে রাসায়নিক অস্ত্রের প্রসঙ্গ। আগেই বলা হয়েছে ইরানের সাথে যুদ্ধের সময় এবং কুর্দদের বিরুদ্ধে ইরাক রাসায়নিক অস্ত্রের প্রয়োগ করেছিল। স্নায়ুর পক্ষে ক্ষতিকারক তিন ধরনের গ্যাস ইরাক তৈরি করেছিল। এই গ্যাসগুলি হল সারিন (Sarin), টাবুন (Tabun) এবং ভি এক্স (VX)। এ প্রসঙ্গে রিটার যে প্রশ্নগুলি রেখেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। প্রথমত তারা যে সময় ইরাক পরিদর্শনে গিয়েছিলেন তখন যা কিছু অস্ত্র ছিল তা ধ্বংস করেছেন। তা সত্ত্বেও যদি ধরে নেওয়া যায় যে, ইরাক এসব গ্যাসগুলি লুকিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছিল, তাহলেও এ প্রসঙ্গে মনে রাখা জরুরি যে, এই গ্যাসগুলি পাঁচ বছর রক্ষা করা যায় না, তাহলে তার কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়।

তৃতীয়ত, জীবাণু অস্ত্র প্রসঙ্গে রিটার দ্বিধাহীনভাবে বলেছিলেন যে, ইরাকের কোন জীবাণু অস্ত্র নেই। ঠিক একই কথা বলেছেন রাষ্ট্রসংঘের জীবাণু অস্ত্র পরীক্ষক ডি স্পার্জেল। যে অ্যানথ্রাক্স জীবাণুর কথা বলা হচ্ছে, তা তিন বছরের বেশি কার্যকর থাকেনা। সুতরাং ১৯৯৮ সালে ইরাক যদি অ্যানথ্রাক্স জীবাণু তৈরি করেও থাকে, বর্তমানে তার কার্যকারিতা থাকা সম্ভব নয়।

চতুর্থত, আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র প্রস্তুতির ক্ষেত্রে ইরাক কতদূর এগিয়েছিল? এখানেও রিটার যে কথা বলেছেন তা প্রমাণ করে যে ইরাক এ ধরনের ক্ষেপণাস্ত্রের ক্ষমতা অর্জন করা দূরের কথা এর প্রাথমিক পর্যায়ও পার হতে পারেনি। প্রথমত, এই ধরনের আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র বা দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ঘরের মধ্যে পরীক্ষা করা যায় না। তা মানুষের নজরে পড়বেই। যে কোন উচ্চপ্রযুক্তি সম্পন্ন রাডারে এর বৈশিষ্ট্য ধরা পড়তে বাধ্য। তবে ইরাক আন্তর্মহাদেশীয় না হলেও কম দূরত্বের স্বয়ংচালিত ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির চেষ্টা বেশ কিছুদিন ধরেই চালিয়েছে। কিন্তু কোনও সাফল্য পায়নি। যতদূর জানা যায় ১৯৮৯ সালে ইরাক এই প্রযুক্তি আয়ত্ত করে যে ক্ষেপণাস্ত্রটি পরীক্ষা করে, সেটি মধ্যপথেই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তারপর কোন অস্ত্র পরীক্ষক বা রাডার এ ধরনের কোন ক্ষেপণাস্ত্রের হদিস পায়নি।

সর্বশেষ কথাটি হল ইরাক ও সাদ্দাম হোসেনের সাথে আল কায়দা গোষ্ঠী বা ওসামা বিন লাদেনের যোগাযোগের প্রশ্ন। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই জানা দরকার, সাদ্দাম যতই স্বৈরতান্ত্রিক হোন না কেন, মধ্যপ্রাচ্যে তাঁর নেতৃত্বেই ইরাক একমাত্র ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল, আর সেই কারণেই সমস্ত মৌলবাদী রাষ্ট্রগুলি এই প্রশ্নে ইরাকের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। আর ঠিক সেই একই কারণে ওসামা বিন লাদেন বহু আগেই সাদ্দামকে ধর্মচ্যুত বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দিয়ে তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল। সুতরাং তার পক্ষে সাদ্দামকে সমর্থন করা অসম্ভব। তাছাড়া মার্কিন-ব্রিটিশ শাসকরাও সাদ্দামের সাথে আল কায়দা গোষ্ঠীর যোগাযোগের কোন প্রমাণ দেখাতে পারেনি।

ছয়ের পাতার পর

মার্কিন আক্রমণে আবার শিশুমৃত্যু আফগানিস্তানে

গজনীতে গত ৬ ডিসেম্বর ৯ শিশুকে হত্যার ঘটনার এক সপ্তাহের মধ্যেই মার্কিন বাহিনীর হাতে দক্ষিণপূর্ব আফগানিস্তানের পাকটিয়া প্রদেশে ৬ শিশু সহ ২ জন বয়স্ক আফগানকে নৃশংসভাবে হত্যার খবর পাওয়া গেছে। একটি দেওয়াল ঘেরা মাঠে বিমান আক্রমণ চালিয়ে এদের হত্যা করা হয়েছে। মার্কিন বাহিনীর মতে ঐ মাঠে সন্ত্রাসবাদীরা নাকি তাদের অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখতো। প্রকৃতপক্ষে পাকটিয়ায় শিশুহত্যার এই ঘটনাটি ঘটেছিল গত ৫ ডিসেম্বর, অর্থাৎ গজনীতে হত্যাকাণ্ড চালাবার একদিন আগেই। কিন্তু এতদিন এ খবর মার্কিন সেনাবিভাগ চেপে রেখেছিল। অবশেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নবাণের সামনে তারা তা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।

সন্ত্রাসবাদ ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

পাঁচের পাতার পর

সুতরাং ইরাকে গণবিধ্বংসী অস্ত্র মজুত রয়েছে এবং তা ধ্বংস করার প্রয়োজনে ইরাক আক্রমণ করা হয়েছে বলে ইঙ্গ-মার্কিন চক্র শুরুতে যে প্রচার চালিয়েছে তার কোনও ভিত্তিই নেই।

জনমতের চাপে ইঙ্গ-মার্কিন চক্রের নতুন প্রচার

ইঙ্গ-মার্কিন চক্র ইরাকের মারণাস্ত্র সম্পর্কে যে অপপ্রচার করেছিল খোদ ব্রিটেন ও আমেরিকায় তা প্রকাশ হয়ে পড়ায় এই দু'দেশের জনমতের সামনে আজ বুশ ও ব্লেয়ার প্রশাসন মিথ্যাবাদী বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। এই অবস্থায় তারা তাদের কৌশল পাল্টাচ্ছে। আমেরিকা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, নাইজার-এর কাছ থেকে সাদ্দাম হোসেন ইউরেনিয়াম কিনেছেন বলে যে তথ্য বুশ দিয়েছিলেন, তা ঠিক নয়। দোষ পড়ছে খোদ সি আই এ-র ঘাড়ে, কারণ তারাই নাকি এই তথ্য দিয়েছিল। অপরদিকে ব্রিটেনে ব্লেয়ার প্রশাসনেরও একই অবস্থা। বিবিসি ব্লেয়ারকে মিথ্যা বলার দায়ে অভিযুক্ত করেছে। তাই তারা এখন অন্য কথা বলছে। মার্কিন প্রশাসন বলছে, আক্রমণের জন্য বর্তমান ইরাক দায়ী নয়, দায়ী ইরাকের অতীত অপরাধ। আর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ব্লেয়ার বলছেন, ইরাকে মারণাস্ত্র ধ্বংসের জন্য তাঁরা যাননি, তাঁরা গিয়েছিলেন মারণাস্ত্র তৈরির সম্ভাবনা নষ্ট করতে। এই দু'দলের যুক্তি এমনই যে, যে কোন দেশকে যে কোন সময় একথা বলে আক্রমণ করা যায় বা দখল করা যায়।

সন্ত্রাসবাদের নাম আমেরিকা

আজ যে কোন অছিলা সৃষ্টি করে আমেরিকা ও তার দোসর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ একের পর এক বিশ্বের ছোট বড় দুর্বল দেশের ওপর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক তথা সামরিক আধিপত্য স্থাপন করছে অথবা তার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। একদিকে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতন, অপরদিকে ডব্লু টি ও-র মাধ্যমে অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন — গোটা দুনিয়াকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী মৃগয়াভূমিতে পরিণত করছে। যেসব অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশ নিজেদের বিকাশের প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি চালু করে দাঁড়াতে চাইছে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আই এম এফ এবং বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণের ফাঁদে ফেলে তাদের অর্থনীতির 'সংস্কার' করতে বাধ্য করছে। আর এই সংস্কারের অর্থ হল বিদেশী বহুজাতিক পুঁজির স্বার্থে বিলগ্নীকরণ, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্পকে ব্যক্তিপুঁজির হাতে তুলে দেওয়া, সর্বোপরি এসব দেশগুলির আর্থিক স্বয়ম্ভরতাকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেওয়া। একদিকে ডব্লু টি ও এইভাবে অর্থনীতিকে ঢেলে সাজাতে বলছে, অপরদিকে কোন রাষ্ট্র যদি এর বিরুদ্ধাচরণ করতে চায়, মাথা তুলে দাঁড়াতে চায়, স্বনির্ভর হয়ে বাঁচতে চায় তাহলেই সেখানে আমেরিকা সামরিক হস্তক্ষেপ ঘটাচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্য থেকে লাতিন আমেরিকা, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া থেকে আফ্রিকা, অথবা মেক্সিকো, ব্রাজিল থেকে ইরাক, ইন্দোনেশিয়া — একই চিত্র। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় আমেরিকার এক বিখ্যাত লেখক হেমিংওয়ের একটি উক্তি ঃ "The first panacea for mismanaged nation is inflation of the currency, the second is war. Both bring a temporary prosperity, both bring a permanent ruin." অর্থনৈতিক মন্দার ধাক্কায় বিপর্যস্ত আমেরিকার শিল্পে মন্দা কাটানোর জন্য যুদ্ধ আজ বড়ই প্রয়োজন, যুদ্ধ তার শিল্পের মরা গাঙে জোয়ার আনবে; অপরদিকে গোটা বিশ্বকে তার পদতলে রাখার প্রয়োজনে যুদ্ধ ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করা আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতির প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা বিশ্বে সন্ত্রাসবাদ খুঁজে বেড়াচ্ছে, সেই আমেরিকারই একজন স্কট রিটার বলেছেন, আমরা বিশ্বের যে কোন লোকের চেয়ে বেশি যোগ্যতার সাথে মানুষ খুন করতে পারি। যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দেশে দেশে সন্ত্রাসবাদী খুঁজে বেড়াচ্ছে তারাই অতীতের ভিয়েতনাম যুদ্ধ থেকে শুরু করে চিলি, ভেনেজুয়েলা, নিকারাগুয়া সহ বর্তমান ইরাক যুদ্ধে কয়েক লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে। কোন দেশ আমেরিকার ছত্রছায়ায় থাকলে সে দেশের শাসকশ্রেণীর হাজার অপরাধ মার্জনা হয়ে যায়, যেমন প্রথম দিকে ইরাকের ক্ষেত্রে হয়েছিল। কিন্তু কোন রাষ্ট্র যদি আমেরিকা বা তার অনুসৃত নীতির বিরোধিতা করে তাহলেই সেই রাষ্ট্রের গায়ে সন্ত্রাসবাদের লেবেল লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট বুশ তাই সদম্ভে ঘোষণা করেন — 'আমরা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছি। যারা আমাদের বিরুদ্ধে, তারাই সন্ত্রাসবাদী।' তাই তাদের তিনি ধ্বংস করবেন। এ প্রসঙ্গে নোয়াম চম্স্কি বলেছেন, "কিন্তু তারা যেকোন রংয়ের যেকোন ধর্মের হতে পারে, তাতে কিছু যায় আসে না। এখানে মূলনীতি হল মার্কিন স্বার্থে কোনও আঘাত লাগছে কিনা?" আর আমেরিকা নিজের স্বার্থসিদ্ধি করাকেই অনুন্নত দেশের আর্থিক উন্নয়নের নামে চালাতে চাইছে। তাদের এই হীন পরিকল্পনাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে চম্স্কি বলেছেন, "তৃতীয় বিশ্বের কোন দেশে বিনিয়োগের পরিবেশ কি উপায়ে উন্নত করবে? একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে, শ্রমিক ইউনিয়ন ও চাষী সংগঠকদের হত্যা করা, চাষীদের ধ্বংস করা এবং সামাজিক কর্মসূচিগুলিকে খাটো করে দেওয়া ইত্যাদি।" নিকারাগুয়ায় আমেরিকার আক্রমণে প্রায় দু'লক্ষ লোক প্রাণ হারায়। এর প্রতিবাদে নিকারাগুয়া আন্তর্জাতিক আদালত অভিযোগ দায়ের করে। ঐ আদালতে আমেরিকাকে দোষী সাব্যস্ত করে নিকারাগুয়াকে ক্ষতিপূরণ দিতে বলে। প্রত্যুত্তরে আন্তর্জাতিক আদালতকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে আমেরিকা নিকারাগুয়ার ওপর আক্রমণ আরও জোরদার করে, ভেঙে গুঁড়িয়ে শ্মশান করে দেয় হাসপাতাল, কৃষিখামার সবকিছু। প্রতিকারের আশায় নিকারাগুয়া রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে আবেদন করে। কিন্তু আমেরিকা ভেটো প্রয়োগ করে সেই আবেদন নাকচ করে দেয়। এই একইভাবে তারা এল সালভাদরে ১৯৮০ সাল থেকে আর্চ বিশপসহ বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী যারাই আমেরিকার বিরোধিতা করেছিল, তাদের সকলকেই হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ড এক দশক ধরে চলে (সূত্র ঃ 'পাওয়ার অ্যাণ্ড টেরর' - চম্স্কি)। এভাবেই আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের বৃহত্তম সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে।

ভ্রমসংশোধন

বিদ্যুৎ গ্রাহকদের উপর সেস বসাবার সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদকের যে বিবৃতি গণদাবীর (৫৬ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা) ৫ ডিসেম্বরের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে, তাতে রাজ্যের বিদ্যুত মাশুল সংক্রান্ত তথ্য ভুল ছাপা হয়েছে। এই মুদ্রণ প্রমাদের জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত।

পার্টি কর্মীর জীবনাবসান

বীরভূম জেলার নলহাটি ২নং লোকাল কমিটির উজিরপুর গ্রামের এস ইউ সি আই কর্মী কমরেড আব্দুর রসিদ সেখ দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ২৮ নভেম্বর বিকাল ৪টায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৪ বৎসর।

কমরেড আব্দুর রসিদ সেখ সত্তর দশকের প্রথম দিকে দলের সাথে যুক্ত হন। বহু বাধা-বিপত্তি, প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি আমৃত্যু দলের একজন কর্মী ছিলেন। গত ২১ আগস্টের বাংলা বন্ধ সফল করার জন্য ক্যান্সার রোগী হয়েও অসুস্থ শরীর নিয়ে বন্ধের মিছিলে যোগদান করেন। তাঁর মৃত্যুর খবর শুনে এলাকার কর্মী-সমর্থকরা তাঁর বাড়িতে আসেন এবং বৈপ্লবিক শ্রদ্ধা জানান।

কমরেড আব্দুর রসিদ সেখ লাল সেলাম

প্রবীণ পার্টি সংগঠকের জীবনাবসান

ঝাড়খণ্ড রাজ্যের পাকুড় ইউনিটের বিশিষ্ট সংগঠক, পাকুড় কোয়ারিজ মজদুর ইউনিয়নের সম্পাদক কমরেড মহম্মদ আমিন দীর্ঘ রোগভোগের পর গত ১৮ নভেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেয়েই বীরভূম জেলা কমিটির সদস্য কমরেড রফিকুল হাসান ও কমরেড মঙ্গল হেমব্রম তাঁর বাড়িতে যান এবং মরদেহে মাল্যদান করে বৈপ্লবিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন।

ষাট-এর দশকের প্রথম দিকে কমরেড জিয়াদ বক্সীর মাধ্যমে মহান মার্ক্সবাদী দার্শনিক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কমরেড আমিন পাকুড় এলাকায় পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। অল্পদিনের মধ্যেই কোয়ারিজ মজদুর ইউনিয়ন ও মোটর বাস মজদুর ইউনিয়ন গড়ে তোলেন। তিনি আজীবন এই দুটি শক্তিশালী ইউনিয়নের সম্পাদক ছিলেন। পাকুড় ঝাড়খণ্ড রাজ্যের মধ্যে পড়লেও সংলগ্ন বীরভূম জেলার মুরারই লোকাল কমিটির সাথে যুক্ত থেকে কমরেড আমিন পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়নের কাজকর্ম করতেন। জীবনের বহু উত্থান-পতন, প্রতিকূল অবস্থা তাঁকে পার্টির রাস্তা থেকে কখনও বিচলিত করতে পারেনি। তিনি পরিবারের সকল সদস্যের মধ্যে পার্টি এবং নেতা ও কমরেডদের প্রতি শ্রদ্ধার মন তৈরি করে গেছেন।

কমরেড মহম্মদ আমিন লাল সেলাম

সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির কোচবিহার জেলা সম্মেলন

সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির কোচবিহার জেলা সম্মেলন ৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জেলাসভাপতি সমীর গুহ মজুমদার। কোচবিহারের বিভিন্ন মহকুমা ও সন্নিহিত আলিপুরদুয়ার ও ফালাকাটা থেকে প্রায় দুইশত প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত ছিলেন। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি কমলেশ ঘোষ সমাগত প্রতিনিধি ও দর্শকবৃন্দকে স্বাগত জানান। সদর মহকুমা সমিতির সভাপতি অবনী রায় মূলপ্রস্তাব পাঠ করেন। মূল প্রস্তাবে বলা হয় যুগ্ম তালিকার বিষয় হল বিদ্যুৎ। কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গসহ অন্যান্য রাজ্য সরকারগুলির সহযোগিতায় ভারতীয় বিদ্যুৎ আইন (২০০৩) সংসদে পাশ করে। এই আইন প্রচলন করে তারা সাধারণ গৃহস্থ, দোকানদার ও ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকদের প্রদেয় বিদ্যুৎ শুল্ক অস্বাভাবিক হারে বাড়াচ্ছে। বৃহৎ শিল্পপতি ও বাণিজ্যসংস্থাগুলিই এর দ্বারা বেশি উপকৃত হবে। অমানবিকভাবে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের উপর জুলুম ও অত্যাচার নামিয়ে আনার হাতিয়ার হল এই ভারতীয় বিদ্যুৎ আইন (২০০৩)। মূল প্রস্তাবের পক্ষে ভাষণ দেন মাথাভাঙ্গার উপেন্দ্রনাথ বর্মন এবং সদর মহকুমার সত্যেন্দ্র ঘোষ।

প্রধান অতিথির ভাষণে রাজ্য কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অমল মাইতি সর্বস্তরের প্রতিনিধিদের অনুরোধ করে বলেন, এই সর্বনাশা বিদ্যুৎ আইনকে বাতিল করতে হলে আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি করতে হবে।

আর একটি প্রস্তাবে স্বরূপ সাহা ভবানীগঞ্জ বাজারের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার এবং বকেয়া বিদ্যুৎ বিল মকুবের আবেদন রাখেন।

সমীর গুহমজুমদারকে সভাপতি ও - ভাস্কর সরকারকে সম্পাদক করে পরবর্তী জেলা কমিটি নির্বাচিত হয়।

মুর্শিদাবাদে কমসোমলের ক্যাম্প

কিশোরদের সংগঠন কমসোমলের মুর্শিদাবাদ জেলা ক্যাম্প বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে গত ২৯-৩০ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হল। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শতাধিক কিশোর কিশোরী সাগরদীঘি স্কুলে হাজির হয়ে প্যারেড, পিটি ও অন্যান্য খেলাধূলার পর রক্তপতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শিবিরের কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করেন এস ইউ সি আই দলের মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সুখেন্দু সেনগুপ্ত। তিনি প্রথম অধিবেশনে স্বাধীনতা আন্দোলনের মনীষীদের জীবনের নানা দিক তুলে ধরে দেখান কেন বর্তমান সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে ছাত্রছাত্রী, কিশোর-কিশোরীদের উন্নত নীতিনৈতিকতার আধারে রাজনীতির চর্চা করতে হবে। ৩০ নভেম্বর সকালে দ্বিতীয় অধিবেশনে আলোচনা করেন পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য এবং মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড স্বপন ঘোষাল। তিনি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজজীবনের নানান সমস্যাগুলি তুলে ধরে দেখান পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতন্ত্র বলে কথিত ভারতবর্ষ নামক আমাদের দেশ একটি বুর্জোয়া রাষ্ট্র। এখানে ধনীদের স্বার্থরক্ষার্থে শ্রমিক-চাষী, সাধারণ মানুষকে শোষণ করা হয়। পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই সাধারণ মানুষকে শোষণ নিপীড়ন থেকে মুক্তি দিতে পারে। তার জন্য প্রয়োজন কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার আলোকে উন্নত বিপ্লবী চরিত্রের সাধনা। এই শিবির সমস্ত প্রতিনিধিকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে।

বিজেপি ও কংগ্রেস দুপক্ষই 'হিন্দুত্ব'কে হাতিয়ার করেছে

একের পাতার পর

ওটা তার নিজস্ব ব্যাপার। যদিও সবাই জানে যে, যোগী যদি শেষমেশ দল ভাঙিয়ে সরকারি গদিতে বসতে পারতেন, তবে হাইকমাণ্ড তাকে জয়মাল্য দিয়ে অভিনন্দন জানাত। ফলে এসব অত্যন্ত পুরনো কৌশল। এছাড়াও টাকার খেলা, প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার, জাতপাতের অঙ্ক, ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি নোংরামি যথেষ্টই করা হয়েছে।

মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে বুর্জোয়াশ্রেণী। মিডিয়ার প্রচারে বলা হচ্ছে, বিজেপি নাকি এবার চারটি রাজ্যেই উন্নয়ন ও জনজীবনের সমস্যাকে ইস্যু করে নির্বাচন লড়েছে। যে তিনটি রাজ্যে বিজেপি জিতেছে, সেখানে যেহেতু কংগ্রেসের সরকার ছিল, তাই জনগণের ক্ষোভ বিক্ষোভ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গিয়ে ভোট পেয়েছে বিজেপি। এভাবে বলার দ্বারা দেখানো হচ্ছে যেন বিজেপির ঝুলিতে 'উন্নয়ন ও জনকল্যাণের' অনেক সার্টিফিকেট আছে, এব্যাপারে বিজেপির রেকর্ড যেন খুব ভাল, তাই জনগণ দলে দলে ভোট দিয়েছে বিজেপিকে। এটা ডাহা মিথ্যা। নাহলে, কেন্দ্রে বিজেপি'র সরকার সত্ত্বেও খোদ দিল্লিতে ক্ষমতাসীন কংগ্রেসই আবার বিপুল ভোটে জিতে আসল কী করে ? ইতিপূর্বে অন্য তিনটি রাজ্যেও একসময় বিজেপি সরকার ছিল। যেদিন ভোটে বিজেপিকে পরাস্ত করে কংগ্রেস এসব রাজ্যে সরকারে বসেছিল, সেদিনও বলা হয়েছিল বিজেপি উন্নয়ন করেনি এবং সেটাকেই ইস্যু করে কংগ্রেস জনগণের ভোট পেয়েছে। ফলে এহেন ব্যাখ্যার মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই।

বুর্জোয়া দলগুলো যেহেতু সরকারে বসে জনগণের স্বার্থ না দেখে বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থ দেখে এবং বুর্জোয়া শোষণে জনজীবনে যেহেতু ক্রমাগত বিপর্যয় ও সমস্যা বাড়ে তাই জনগণের ক্ষোভ স্বভাবতই সরকারে আসীন দলটির বিরুদ্ধে যায়। একেই বলা হয় 'অ্যান্টি ইনকামবেন্সি'। প্রকৃত গণআন্দোলন থাকলে জনগণের এই ন্যায্যক্ষোভ শুধুমাত্র নির্বাচনমুখী না হয়ে অন্য খাতে যাওয়ার কথা। শাসক বুর্জোয়াশ্রেণী জনগণের এই ক্ষোভকে সর্বদা ভোটের দিকে ঠেলে দিতে চায়। সেজন্য সরকারি দলের বিরুদ্ধে আর একটা বুর্জোয়া দলকে খাড়া করে বিকল্প ত্রাতারূপে প্রচার দেয়। এভাবে পার্লামেন্টারি রাজনীতির ভোটসর্বস্ব ঘেরাটোপের মধ্যে জনগণকে পাক খাওয়ায় বুর্জোয়াশ্রেণী।

ব্যাখ্যাকাররা বলছেন, এই নির্বাচনে কংগ্রেসের চেয়ে বিজেপির ঘর নাকি অনেক বেশি গোছানো ছিল। আত্মসন্তুষ্টি, ক্ষমতাভোগী ও ক্ষমতাবঞ্চিত নেতাদের মধ্যে খেয়োখেয়ি, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ইত্যাদিতে বিদীর্ণ ছিল কংগ্রেস। অন্যদিকে বিজেপি'র মধ্যেকার কোন্দল খুব একটা বাইরে আসতে পারেনি। ক্ষমতায় যে-দল থাকে, ক্ষমতার খেয়োখেয়ি তাদের মধ্যে নগ্ন হয়ে পড়ে। অপরদিকে ক্ষমতায় যাওয়ার আশা যারা করছে, ক্ষমতা পাওয়ার টোপ তাদের খেয়োখেয়িকে সাময়িকভাবে চাপা দিয়ে রাখে। বিজেপি যখন এইসব রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল তখনও এই কাণ্ডটাই ঘটেছিল। সেদিন বিজেপির পরাজয়েও আভ্যন্তরীণ কলহকে অন্যতম কারণরূপে দেখানো হয়েছিল। গুজরাট নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদি সংখ্যালঘু হত্যার মধ্য দিয়ে উগ্র হিন্দুত্বের তুমুল জিগির তুলেই গুজরাটের বিজেপি ভিতরকার কোন্দলকে চাপা দিয়েছিলেন। মোদির বিরোধিতা করার অপরাধে বিজেপি নেতা হরেন পাণ্ডিয়া কেবল নির্বাচনী টিকিট পাননি তাই নয়, তাকে শেষপর্যন্ত প্রাণ দিতে হয়েছে গুপ্তঘাতকদের গুলিতে। ফলে বিজেপির সংহতি ও শৃঙ্খলার ফানুস উড়িয়ে লাভ নেই।

এমনও বলা হচ্ছে যে, এই নির্বাচনে বিজেপি তার প্রধান রাজনৈতিক হাতিয়ার 'হিন্দুত্ব'কে ব্যবহার করেনি, যার দ্বারা নাকি প্রমাণ হয় বিজেপি উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি ছেড়ে বেরিয়ে আসছে। হয় দৃষ্টিবিভ্রম থেকে নাহয় জেনেবুঝে এই মিথ্যা প্রচারটিকে সাজানো হচ্ছে বিজেপিকে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে এককভাবে কেন্দ্রে পৌঁছবার রাস্তা করে দেওয়ার জন্য। বাবরি মসজিদ ধ্বংসকাণ্ডের একজন হোতা গেরুয়াবসন পরিহিতা উমা ভারতী, রাজস্থানে নির্বাচনী প্রচারে সংখ্যালঘু হত্যার নায়ক নরেন্দ্র মোদি — এরাই তো বিজেপির রাজনৈতিক হিন্দুত্বের প্রতীক। এছাড়াও হাজার হাজার আর এস এস কর্মী সংগঠকদের অন্যান্য রাজ্য থেকে আনা হয়েছিল নির্বাচনে কাজ করার জন্য। জয়ের পর উমা ভারতীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে ভীড় করেছিল ত্রিশূলধারী সাধুরা। চারদিকে ছিল 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি। উপস্থিত ছিলেন বিশ্বহিন্দু পরিষদের গিরিরাজ কিশোর, রামজন্মভূমি ন্যাস-এর নৃত্যগোপাল দাস এবং আর এস এস নেতা মদন দাস দেবি। জয়পুরে বসুন্ধরা রাজে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ছবি তুললেন নরেন্দ্র মোদিকে পাশে নিয়ে। আর ছত্তিশগড়ের রায়পুরে রমন সিং পূজা দিলেন 'দেবতাদের' — যার মধ্যে অন্যতম ছিল 'গো-মাতা'। নির্বাচনী প্রচারে বিজেপি নেতারা '৩৭০ ধারা', 'অভিন্ন দেওয়ানী বিধি', 'সংখ্যালঘু তোষণ চলবেনা' ইত্যাদি বাঁধা বুলি ব্যবহার করলেন কি করলেন না, তা দিয়ে প্রমাণ হয় না যে, বিজেপি হিন্দুত্বকে হাতিয়ার করেনি। পাকিস্তানকে সামনে রেখে 'সীমান্ত সমস্যা', 'সন্ত্রাসবাদ' ইত্যাদি ধ্বনি দিয়ে উগ্র জাতীয়তার জঙ্গিয়ানাও বিজেপি'র হিন্দুত্বকেই খাদ্য জোগায়। সর্বোপরি উমা ভারতী, নরেন্দ্র মোদী প্রভৃতির উপস্থিতিই উগ্র হিন্দুত্ববাদের প্রকাশ্য বা চাপা জোয়ার সৃষ্টি করার পক্ষে যথেষ্ট।

কিন্তু এভাবে সরকারবিরোধী গণবিক্ষোভের সঙ্গে উগ্র হিন্দুত্বের রাজনীতি মিশিয়ে বিজেপির পক্ষে ফসল তোলা সম্ভব হত না, যদি কংগ্রেস, আর কিছু না হোক, যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে চলত। কংগ্রেসকে ধর্মনিরপেক্ষ প্রমাণ করতে সি পি আই (এম) যতই চেষ্টা চালাক, বাস্তবে কোনদিনই কংগ্রেস তা ছিল না, আজও নেই। গুজরাটের বিধানসভা নির্বাচনের মতোই এবারের নির্বাচনেও বিজেপি'র উগ্র হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে কংগ্রেস 'নরম' হিন্দুত্ব'র লাইন নিয়েছিল। মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী দিগ্বিজয় সিং এবার নির্বাচনের বেশ কয়েকমাস আগেই 'গোহত্যা বন্ধের' আইন করার জন্য আওয়াজ তোলেন। ছত্তিশগড়ের অজিত যোগী বিজেপির 'রামজন্মভূমি'র পাল্টা হিসাবে 'কৌশল্যা জন্মভূমি' আবিষ্কার করে মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এছাড়া জাতপাতের ভোট ব্যাংকের রাজনীতি তো ছিলই। কংগ্রেসের এই হিন্দুত্ব প্রচার শেষপর্যন্ত বিজেপি-কেই মুনাফা দিয়েছে। বাবরি মসজিদের তালা খুলে দিয়েছিলেন রাজীব গান্ধী। হিন্দুত্বকে তোষামোদ করে ভোটে তার ফয়দা তুলবেন — এটাই ছিল তাঁর পরিকল্পনা। অথচ ভোটে তার পূর্ণ ফয়দা তুলেছে আরএসএস-বিজেপি। এখনও সেটাই নির্বাচনে বিজেপি'র তুরুপের তাস। এবার মধ্যপ্রদেশে দিগ্বিজয় সিং গ্রামীণ ভোট ব্যাংক তৈরির জন্য, পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম-এর কায়দায় গ্রামে গ্রামে নানাভাবে অর্থ ঢেলেছিলেন। ছত্তিশগড়ের অজিত যোগীও 'উন্নয়ন'-এর নামে ভোটব্যাংক তৈরির চেষ্টা করেছেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত এরাও ভোটে জেতার জন্য বিজেপি'র 'হিন্দুত্বে'র পাল্টা কংগ্রেসী 'হিন্দুত্বে'র সেই একই নোংরা রাজনীতিকে হাতিয়ার করলেন, যা সাম্প্রদায়িকতার চোরা আগুনে বাতাস দিয়ে বিজেপি-কেই সুবিধা করে দিল। এটাই স্বাভাবিক। বিজেপি'র সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে কখনই কংগ্রেসের পাল্টা সাম্প্রদায়িক রাজনীতি দিয়ে পরাস্ত করা যায়না। যদিও সিপিআই(এম) নেতৃত্ব এখনও কিছু আসনের আশায় কংগ্রেসকেই 'ধর্মনিরপেক্ষ' বানিয়ে তার সাথে নির্বাচনী জোট করার সুবিধাবাদী লাইন নিয়ে চলছে।

একথা ঠিক যে, কংগ্রেস এবার নেতৃত্বের সঙ্কটে ভুগেছে। রাজ্যে রাজ্যে তুমুল আভ্যন্তরীণ বিরোধকে সামাল দিতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যে পারেনি, শক্তিশালী নেতৃত্বের অভাবই তার অন্যতম কারণ। তিন রাজ্যেই কংগ্রেসের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীগুলো সরকারি প্রার্থীদের হারাবার জন্য উঠে পড়ে নেমেছিল।

কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, শাসক বুর্জোয়া শ্রেণীর সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ার প্রশ্নে বর্তমান সময়ে বিজেপি কিছুটা এগিয়ে আছে কংগ্রেসের চেয়ে। যে নয়া আর্থিক ও শিল্পনীতির উপর ভর করে শাসক বুর্জোয়াশ্রেণী বর্তমানে শোষণকে আরও নির্মম করতে চাইছে, সেই নীতির শুরু কংগ্রেস করলেও তার দ্রুত ও ব্যাপক প্রয়োগ ঘটিয়ে বিজেপি নিজেকে শাসকশ্রেণীর কাছে অত্যন্ত বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য ও দক্ষ সেবাদাসরূপে হাজির করতে পেরেছে। শুধু ভারতের একচেটে পুঁজিপতিদের আশীর্বাদই নয়। আন্তর্জাতিক পুঁজি তথা মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলির আশীর্বাদ তো বটেই, খোদ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সুনজরে আছে বিজেপি। দুনিয়াজোড়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন আগ্রাসন থেকে বিশ্বের মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে মার্কিন শাসকরা যখন 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে'র ধুয়ো তুলল, তার সাথে কণ্ঠ মেলাল বিজেপি সরকার। আমেরিকার প্রস্তাব অনুযায়ী ইরাকে ভারতীয় সেনা পাঠাবার আয়োজন সম্পূর্ণ করে ফেললেও বিজেপি-কে যখন ভোটের দিকে তাকিয়ে পিছু হঠতে হয়েছে — তখন মার্কিন শাসকরা রুষ্ট না হয়ে এই অসুবিধায় বিজেপি সরকারকে সহানুভূতি দেখিয়েছে। মার্কিন শাসকদের সাথে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করার জন্যই বিজেপি সরকার সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী গণহত্যাকারী শ্যারনকে ভারতে অভ্যর্থনা দিয়েছে। সর্বশেষ মার্কিন শাসকদের কথামতই বিজেপি সরকার পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা শুরু করার দিকে যাচ্ছে। এসবের ফলেই ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজি ও বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি দুয়েরই সমর্থনের কাঁটা এখন কংগ্রেসের চেয়ে বিজেপির দিকে ঢলে আছে বেশি। পুঁজির এই সমর্থন ও আশীর্বাদই শেষপর্যন্ত বুর্জোয়া গণতন্ত্রে নির্বাচনী ফলাফল নির্ধারণের ক্ষেত্রে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে যাকে, যেটা অসংগঠিত ও অসচেতন জনগণ ধরতে ও বুঝতে পারেনা।

সুতরাং, এহেন নির্বাচনে যে বুর্জোয়া দলই জিতুক, জনগণের কোনও কল্যাণ তার দ্বারা হয়না। পুঁজিবাদী শোষণজুলুমের দড়ি দেশের সাধারণ মানুষের গলায় যেভাবে চেপে বসানো হচ্ছে, তাতে নির্বাচনে নিছক সরকার বদল কোনও স্বস্তি এনে দিতে পারবে না। শোষণের দড়িকে যদি কিছুটা আলগা করে নিঃশ্বাস নিতেও হয়, তবে শ্রেণীসংগ্রাম ও গণসংগ্রামই একমাত্র রাস্তা। এরই অঙ্গ করে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তীব্র আদর্শগত লড়াই চালাতে হবে। কিন্তু সিপিএম, সিপিআই-এর মত বামপন্থী দলগুলি এ পথে না এসে নির্বাচনমুখী রাজনীতি করছে, কংগ্রেস ও অন্যান্য বুর্জোয়া দলের সাথে মিলে তৃতীয় ফ্রন্ট নামে ভোটের আঁতাত গড়ার পথে চলছে। অথচ, বাস্তবে যত দিন যাচ্ছে, স্পষ্ট হচ্ছে যে, গণআন্দোলন ছাড়া শোষিত মানুষ বেঁচে থাকার সুযোগও পাবে না।

নিস্তারিণী কলেজে ডি এস ও'র আন্দোলন

দেশবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত পুরুলিয়া জেলার একমাত্র মহিলা কলেজ নিস্তারিণীতে আবার কলেজের অধ্যক্ষ, হেডক্লার্ক ও কিছু অধ্যাপকের প্রত্যক্ষ মদতে নির্বাচনের নামে হয়ে গেল নির্লজ্জ প্রহসন। গত ১ ও ২ ডিসেম্বর দুদিনই ডি এস ও'র ছাত্রী কর্মীদের উপর বলপ্রয়োগ করে কলেজ কর্তৃপক্ষের মদতে এস এফ আই মনোনয়নপত্র তুলতে বাধা দেয়। বার বার অধ্যক্ষাকে জানানো সত্ত্বেও তিনি এর প্রতিকার না করায় মনোনয়নপত্র তোলার শেষদিন ২ ডিসেম্বর বিকালে শতাধিক ছাত্রী মনোনয়নপত্র দেওয়ার দাবিতে কলেজ সংলগ্ন দেশবন্ধু রোড অবরোধ করে। ৪ ডিসেম্বর কলেজে এই দাবিতে স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট পালিত হয়। ছাত্রীদের গণতান্ত্রিক অধিকারে হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে ঐদিন পুরুলিয়া শহরের জে কে কলেজেও ছাত্র-ছাত্রীরা ধর্মঘট পালন করে এবং জেলার সমস্ত স্কুল-কলেজে প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। ৫ ডিসেম্বর ডি এস ও'র জেলা কমিটির উদ্যোগে কলেজ গেটে প্রতিবাদ সভা আহূত হয়। সভায় কলেজের ছাত্রীদের সঙ্গে জেকে কলেজের পক্ষ থেকেও এই অন্যায়ের প্রতিবাদে বক্তব্য রাখা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডি এস ও জেলা সভাপতি কমরেড রঙ্গলাল কুমার। মূল বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক কমরেড পরীক্ষিৎ গঁরাই ও সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রাণী মাহাত এবং কমরেড সৌরভ ঘোষ। সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে ছাত্রীদের স্বাক্ষরসহ প্রতিবাদপত্র পাঠানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরপরও কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রীদের সংসদ নির্বাচনের অধিকার ফিরিয়ে দিয়ে সুষ্ঠু নির্বাচন না করলে বৃহত্তর আন্দোলন হবে বলে জানানো হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই কলেজে ডি এস ও'র আন্দোলনের চাপে ফি-বৃদ্ধি রোধ, নির্বাচনের অধিকার, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী কলেজে রাখা সহ বহু দাবি আদায় হয়েছে। এ কারণে ছাত্রীরা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

MM & PO /WB / RNP 288/2003 R. No 5268 / 60

গণদাবী ১৯ ডিসেম্বর, ২০০৩ ৫৬ বর্ষ / ১৮ সংখ্যা

খবর এক নজরে

চোরের সাক্ষী গাঁট কাটা

জুদেও কাণ্ডের তদন্ত করতে জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটি বসানোর দাবি নাকচ করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। জুদেও-এর ঘুষ নেওয়ার ভিডিও ছবি প্রকাশিত হওয়ায় বিজেপি নেতারা লজ্জিত নন, আলোকচিত্রীকে খুঁজে বের করতেই তারা কোমর বেঁধে নেমেছেন। বাজপেয়ি বলে দিয়েছেন — আনীত অভিযোগ মিথ্যা। তদন্তের দরকার নেই। (হিন্দুস্তান টাইমস, ১২-১২-০৩)

বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকানা পানের দোকান

"ছত্তিশগড়ে কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী অজিত যোগীর জমানায় গত তিন বছরে ৭৯টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গজিয়ে উঠেছিল। যাদের কার্যত কোনও অফিসই নেই। এদের অধিকাংশেরই ঠিকানা হল পানের দোকান, মালগুদাম ও রেস্তোরাঁ। (বর্তমান, ১১-১২-০৩)

প্রসঙ্গ তারকেশ্বর লোহার

মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ৮ ডিসেম্বর বিধানসভায় জানান, দলগাঁও চা-বাগানের তারকেশ্বর লোহার এক সময় দলের ভালো কর্মী ছিলেন। পরে তাঁর অধঃপতন হয়। দলও তাঁর কাজকর্ম সম্পর্কে সব জানত। তাই তাঁকে সবকিছু থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে যে বাম বিধায়করা দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব এনেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আর এস পি-র তপন হোড় বিধানসভার লবিতে বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতিতে আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট নই। কংগ্রেস থেকে সিটুতে যোগ দিয়ে তারকেশ্বর লোহার দলগাঁও চা-বাগানে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন। জেলা বামফ্রন্ট ও প্রশাসনকে তাঁর দৌরাত্ম্যের কথা জানালেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। (বর্তমান ৯-১২-০৩)

কর্ণাটকের ধাঁচে এ রাজ্যেও সরকারি কর্মী কমানোর উদ্যোগ

কেন্দ্রীয় সরকার ও কর্ণাটক রাজ্য সরকারের পথ অনুসরণ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বেশ কয়েক হাজার 'অতিরিক্ত' কর্মচারীকে বিশেষ স্বেচ্ছাবসর প্রকল্পের আওতায় আনার কাজ শুরু করেছে। মুখ্যসচিবের জারি করা নির্দেশ মেনে অতিরিক্ত কর্মচারী বাছাইয়ের কাজ জোর কদমে চলছে। আগামী ৩১ জানুয়ারির মধ্যে চূড়ান্ত পদক্ষেপ শুরু হয়ে যাবে বলে মহাকরণের খবর। (বর্তমান ৯-১২-০৩)

দেশ এগোচ্ছে

রেলের গ্যাংম্যানের চাকরির সর্বমোট বেতন ৫ হাজার টাকা। যোগ্যতা ক্লাস এইট পাশ। সম্প্রতি ২০ হাজার গ্যাংম্যানের শূন্যপদ পূরণের জন্য বিজ্ঞাপন বেরোতেই দরখাস্ত পড়েছে ৬০ লাখ। এর মধ্যে ইঞ্জিনিয়ার ২৫ হাজার, এবং ৫ হাজার এম বি এ। (বর্তমান ১৪-১১-০৩)

শ্রমিক আন্দোলন নেই, তবুও কারখানা বন্ধ

গত ১১ ডিসেম্বর হাওড়ায় তিনটি কারখানা — কেম রাবার প্রাইভেট লিমিটেডের দুটি ইউনিট এবং আগরওয়াল হার্ডওয়ার অ্যাণ্ড ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড-এ 'সাসপেনশন অব ওয়ার্ক' ঘোষণা করা হয়েছে। কেম রাবারে ৩৭০ জন ও হার্ডওয়ার কোম্পানিতে ১২০ জন শ্রমিক কাজ করেন। ইতিপূর্বে ৯ ডিসেম্বর বাউড়িয়ার বিখ্যাত ফোর্ট গ্লস্টার ইণ্ডাস্ট্রিতে সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক জারি করা হয়। (বর্তমান ১১-১২০৩)

ইঁদুর টিকটিকি বাদ

আয় বাড়াবার জন্য রাজ্য সরকার গেরস্থর ঘরের গরু, ছাগল এবং সাইকেলের ওপর নতুন করে কর বসাবার প্রস্তাব এনেছে।

(বর্তমান ১১-১২-০৩)

বিদেশ

বোয়িং মুখ থুবড়ে পড়ছে

বোয়িং কোম্পানি তাদের ৩৪০ জন কর্মচারীকে লে-অফ করার জন্য নোটিশ দিল। কোম্পানির মুখপাত্র জানিয়েছেন, ২০০৩ সালের শেষে কোম্পানি ৪০ হাজার কর্মচারীকে ছেঁটে ফেলবে। এই ছাঁটাই হবে কোম্পানির বাণিজ্যিক বিমান নির্মাণ শাখায়। (এপি, হিন্দুস্থান টাইমস্, ২৩-১১-০৩)

জেরক্স কোম্পানিতে ৮০০ ছাঁটাই

মার্কিন বহুজাতিক জেরক্স কোম্পানি তাদের রচেস্টার কারখানায় মোট ৮০০টি পদ বিলোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

উল্লেখ্য যে, জেরক্স কোম্পানি গত দুবছরে মোট ৬২,৮০০ জন কর্মচারীকে ছাঁটাই করেছে।

(ডেকান হেরাল্ড, ৫-১২-০৩)

দক্ষিণ কোরিয়ায় শ্রমনীতির প্রতিবাদ

দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের প্রস্তাবিত শ্রমনীতিতে বলা হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প সংস্থাগুলিতে ধর্মঘটের জন্য ৯০ দিন আগে নোটিশ দিতে হবে এবং ধর্মঘট ও লে-অফ চলাকালীন সময়ে শ্রমিকদের পুরো মজুরি দেওয়া হবে না। দেশের সব কটি শ্রমিক সংগঠন এই শ্রমনীতিকে শ্রমিক স্বার্থবিরোধী আখ্যা দিয়েছে। এর বিরুদ্ধে ২৫ নভেম্বরের ধর্মঘটে ৭ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী অংশ নিয়েছে। বৃহত্তম মোটরগাড়ি প্রস্তুতকারক সংস্থা হুন্ডাই কোম্পানিসহ দেশের ১৮০টি শিল্প সংস্থায় ধর্মঘটের জেরে কাজকর্ম অচল হয়ে যায়। পুলিশি নিষেধাজ্ঞাকে অমান্য করে ঐ দিন দেড়লক্ষ ধর্মঘটী শ্রমিক সিওল শহরে মিছিল করেছে।

(রয়টার্স, ডেকান হেরাল্ড, ২৬-১১-০৩)

ইরাকি বোমার আতঙ্কে মার্কিন সেনা

খেলনা গাড়ি, খালি কোকের ক্যান ও পশুদের শবদেহ — ইরাকি মুক্তি সেনানী গেরিলারা এসব জিনিসের মধ্যে বারুদ ভরে রাস্তার ধারে ফেলে রাখছে, মার্কিন সেনারা সেখান দিয়ে গেলেই দূরনিয়ন্ত্রণের সাহায্যে তা ফাটিয়ে দিচ্ছে। দিশাহারা, ভয়ার্ত মার্কিন সেনারা এখন যে কোন ইরাকিকে রাস্তার ধারে খেলনা, ক্যান বা পশুদেহ ফেলতে দেখলেই গুলি করে হত্যা করছে।

জনৈক মার্কিন সেনা অফিসারের বক্তব্য, আমাদের হাতে ক্ষেপণাস্ত্র, হেলিকপ্টার ও নানা হাইটেক অস্ত্র আছে, কিন্তু তা দিয়ে ঘরে ঘরে তৈরি দেশি অস্ত্রের মোকাবিলা করা অসম্ভব।

(দি টাইমস অফ ইণ্ডিয়া ১১-১২-০৩)

ইরাকিদের আস্থা নেই

সম্প্রতি ব্রিটেনে প্রকাশিত এক সমীক্ষা রিপোর্টে জানানো হয়েছে, মার্কিন নেতৃত্বাধীন দখলদার সেনাদের উপর প্রায় আশি শতাংশ ইরাকির কোনো আস্থা নেই। গত এপ্রিলে ইরাকে দখলদার বাহিনীর বোমাবর্ষণ, যুদ্ধ এবং ইরাকি সেনাবাহিনীর পরাজয়কে তারা দুঃখজনক ঘটনা বলেই মনে করে। (রয়টার্স লণ্ডন, হিন্দুস্থান টাইমস্ ২-১২-০৩)

ইরাকে সেনা পাঠানোর বিরুদ্ধে সিওল এবং টোকিওতে বিক্ষোভ

ইরাকে সেনা পাঠানোর সরকারি সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে ৬ ডিসেম্বর দশ হাজার মানুষ দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিওলে মার্কিন দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছে। সেদিন তাপমাত্রা ছিল শূন্য ডিগ্রির নীচে এবং সেই সঙ্গে চলছিল প্রচণ্ড তুষার ঝড়। (এ এফ পি, ৭-১২-০৩)

ইরাকে জাপানি সেনা পাঠানোর বিরোধিতা করে ৭ ডিসেম্বর প্রায় ৫ হাজার মানুষ টোকিও শহরে মিছিল করেছে।

(এপি, ডেকান হেরাল্ড, ৮-১২-০৩)

মিছিলে নজরদারি

আমেরিকার অর্ন্তদেশিয় গোয়েন্দা সংস্থা এফ বি আই সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভকারী এবং যুদ্ধবিরোধী মিছিলগুলি সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করবে। কর্তাব্যক্তিরা জানিয়েছে, আইন মেনে যারা রাজনৈতিক বক্তৃতা করবে বা মিছিল করবে, তারা এই নির্দেশের লক্ষ্য নয়। কিন্তু মানবাধিকার কর্মীরা আশঙ্কা করছেন যে, ১৯৬০ এবং ১৯৭০ সালে এফ বি আই-র প্রাক্তন অধিকর্তা এডগার হুভারের আমলে মার্টিন লুথার কিং প্রমুখ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের উপর গোয়েন্দাগিরি চালানোর দিনগুলি ফিরে আসছে। সন্ত্রাসবাদ এবং শান্তিপূর্ণ আইন অমান্য আন্দোলনের মধ্যেকার ফারাকটা একাকার করে দিচ্ছে এফ বি আই। (দি হিন্দু ২৪-১১-২০০৩)

রাশিয়ায় গণতন্ত্র

৭ ডিসেম্বর রুশ পার্লামেন্ট ডুমার ভোটের দিন প্রধানমন্ত্রী মিখাইল কাসিয়ানভের দিকে একটি মেয়ে ডিম ছুঁড়েছে। মেয়েটি চিৎকার করে বলে — 'কাসিয়ানভ, ভোট হচ্ছে না, হচ্ছে প্রহসন।' কাসিয়ানভ জবাব দেন — 'এটা গণতন্ত্রেরই অঙ্গ।' মেয়েটি রেহাই পায়নি, প্রধানমন্ত্রীর দেহরক্ষীরা তৎক্ষণাৎ তাকে ও তার সঙ্গীকে গ্রেপ্তার করেছে। (দি স্টেটসম্যান ৮-১২-০৩)

ন্যায্য দামে ধান কেনার দাবি

একের পাতার পর

উল্লেখ্য গত বছর ঠিক এভাবেই অধিকাংশ ধান জলের দামে মিল মালিকরা কিনে নেওয়ার পর সরকার অতি বিলম্বে কুইন্টাল প্রতি ধানের দাম ৫৫০ টাকা ঘোষণা করে, যাতে লাভবান হয় ধনী চাষী, মিল মালিক ও মজুতদারেরা। আর গরিব ও মধ্যবিত্ত চাষীরা সর্বস্বান্ত হয়। এমনকি অতি সস্তায় ধান কিনে মিল মালিকরা স্থানীয় পঞ্চায়েত, বিডিও অফিস ও সি পি এম নেতাদের যোগসাজসে সরকার নির্ধারিত দামে কিনেছে এই প্রমাণ দাখিল করে অত্যধিক মুনাফা লুটেছে। ক্যাগ-এর রিপোর্ট অনুযায়ী এভাবে সরকার মিল মালিকদের অতিরিক্ত ২০ কোটি টাকা পাইয়ে দিয়েছে। এবারও একই জিনিস ঘটতে চলেছে। এবার চাষীদের উৎপাদন ব্যয়ও অনেক বেড়েছে।

আমরা সরকারের এই কৃষক স্বার্থবিরোধী ও মিলমালিক-মজুতদার-জোতদার ঘেঁষা নীতির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে দাবি করছি ঃ

১। অবিলম্বে ধানের বিক্রয় মূল্য ৬৫০ টাকা ধার্য করতে হবে;

২। রাজ্য সরকার এবং এফ সি আই-কে সরাসরি চাষীদের কাছ থেকে সমস্ত ধান কিনে মিলকে পারিশ্রমিক দিয়ে ভাঙিয়ে নিতে হবে;

৩। এই চাল নির্দিষ্ট সস্তা দরে বাজারে সরবরাহ করতে হবে এবং ভরতুকি দিয়ে গরিবদের দিতে হবে।

উপরোক্ত দাবিতে ১৮ ডিসেম্বর রাজ্যব্যাপী সকল বিডিও অফিসে এবং ২৩ ডিসেম্বর সকল ডি এম অফিসে বিক্ষোভ, ধর্ণা এবং ডেপুটেশন দেওয়া হবে।

'ইকোটুরিজম'-এর নামে কোটি কোটি টাকার সম্পদে ভরপুর সুন্দরবন এলাকাকে সাহারা ইন্ডিয়া সহ দেশি-বিদেশি বৃহৎ মালিকদের হাতে তুলে দিয়ে পরিবেশদূষণ ও অপসংস্কৃতি প্রসারের অপচেষ্টা এবং লক্ষ লক্ষ মৎস্যজীবীর জীবন-জীবিকা ধ্বংস করার চক্রান্তের প্রতিবাদে

মৎস্যজীবীদের কনভেনশন

কলকাতা ২৬ ডিসেম্বর, বেলা ১০টা

মৌলালি যুব কেন্দ্র

বক্তা ঃ

ডঃ সুশীলকুমার মুখার্জী (বিশিষ্ট বিজ্ঞানী)

অধ্যাপক তরুণ সান্যাল (বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী)

শ্রী চির দত্ত (পরিবেশবিদ)

অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর ঘটক (ভূতত্ত্ববিদ) ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল ইউনাইটেড ফিসারমেন এ্যাসোসিয়েনস্

সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের

পঞ্চম রাজ্য সম্মেলন

প্রকাশ্য সমাবেশ

২৭ ডিসেম্বর, ২০০৩

এফ. ইউ. সি ময়দান, বেলা ৩টা

প্রধান বক্তা ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ

সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি, এস ইউ সি আই

বক্তা ঃ কমরেড প্রতিভা মুখার্জী, সভানেত্রী, সারা ভারত কমিটি

কমরেড ছায়া মুখার্জী, সাধারণ সম্পাদিকা, সারা ভারত কমিটি

কমরেড সাধনা চৌধুরী, সম্পাদিকা,এ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

প্রতিনিধি সম্মেলন ঃ ২৮ - ২৯ ডিসেম্বর কে. এন কলেজিয়েট স্কুল

সম্পাদক মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৪৪-০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net